POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

আল্লাহ্‌র বাণী

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ○

এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল), 'আমি নিকেট আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাহতে তাহারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। (আল বাকারা: ১৮৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 11

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 12

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 19 Mar 2026 29 রমযান 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

রমযান রহমত, মাগফিরাত ও আগুন থেকে মুক্তির মাধ্যম

হযরত সালমান ফারসি (রা.) বর্ণনা করেন যে শাবান মাসের শেষ দিনে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের উদ্দেশে খুতবা দিতে গিয়ে বললেন:

"হে লোকসকল! তোমাদের উপর একটি মহান মাস ছায়া বিস্তার করেছে। এটি এমন এক বরকতময় মাস, যার মধ্যে একটি রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। আল্লাহ তা'আলা এই মাসের রোজাগুলোকে ফরজ করেছেন এবং এই মাসের রাত্রিগুলোতে কিয়াম (ইবাদত) করা নফল হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি এই মাসে নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চায়, সে যেন রমজান ছাড়া অন্য সময়ে একটি ফরজ আদায় করল। আর যে ব্যক্তি এই মাসে একটি ফরজ আদায় করে, সে যেন রমজান ছাড়া অন্য সময়ে সত্তরটি ফরজ আদায় করল।

এটি ধৈর্যের মাস, আর ধৈর্যের প্রতিদান হলো জান্নাত। এটি সহমর্মিতা ও দুঃখকষ্টে অংশ নেওয়ার মাস। এটি এমন একটি মাস যাতে মুমিনের রিজিক বৃদ্ধি পায়। এই মাসে কোনো রোজাদারকে ইফতার করানো গুনাহ মাফ হওয়ার এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার কারণ হয়। আর যে ব্যক্তি ইফতার করাবে, সে রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, অথচ রোজাদারের সওয়াবে কোনো কমতি করা হবে না।

তখন সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সবার পক্ষে তো রোজাদারকে ইফতার করানো সম্ভব নয়।'

তখন তিনি বললেন, 'এই সওয়াব সেই ব্যক্তিও পাবে, যে কোনো রোজাদারকে এক চুমুক দুধ, অথবা এক চুমুক পানি, কিংবা একটি খেজুর দিয়ে ইফতার করায়। আর যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে পেট ভরে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে আমার হাউয (কাউসার) থেকে এমনভাবে পান করাবেন যে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে আর পিপাসার্ত হবে না।'

'এটি এমন একটি মাস যার প্রথম অংশ রহমত, মধ্যভাগ মাগফিরাত এবং শেষ অংশ জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি। আর যে ব্যক্তি এই মাসে নিজের অধীনস্থ কর্মচারীর কাজ হালকা করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন এবং তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করবেন।'

মুমিনের উচিত যে সে যেন নিজের সত্তার মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহ তা'আলার পথে সাহসী প্রমাণ করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

যদি আল্লাহ চাইতেন তবে অন্যান্য উম্মতের মতো এই উম্মতের উপর কোনো বিধিনিষেধ রাখতেন না। কিন্তু তিনি কল্যাণের জন্যই কিছু বিধিনিষেধ রেখেছেন। আমার মতে মূল বিষয় হলো-যখন মানুষ সত্যতা ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে যে, এই মাসে তুমি আমাকে বঞ্চিত করো না, তখন আল্লাহ তাকে বঞ্চিত করেন না। এমন অবস্থায় যদি মানুষ রমজান মাসে অসুস্থ হয়ে যায়, তবে সেই অসুস্থতা তার জন্য রহমত হয়ে দাঁড়ায়। কারণ প্রত্যেক কাজের ভিত্তি হচ্ছে নিয়ত।

মুমিনের উচিত যে সে যেন নিজের সত্তার মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহ তা'আলার পথে সাহসী প্রমাণ করে। যে ব্যক্তি রোজা রাখতে পারেনি, কিন্তু তার অন্তরে আন্তরিকভাবে এই নিয়ত ছিল যে-হায়! আমি যদি সুস্থ হতাম তবে রোজা রাখতাম, এবং তার অন্তর এ বিষয়ে কাঁদছে, তবে ফেরেশতাগণ তার জন্য রোজা রাখবে-যদি না সে অজুহাত খোঁজার মানুষ হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা কখনোই তাকে সওয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না।

কিন্তু বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যায় যদি কোনো ব্যক্তির কাছে (নিজের নফসের অলসতার কারণে) রোজা রাখা কঠিন মনে হয় এবং সে নিজের মনে ধারণা করে যে আমি অসুস্থ, আর আমার অবস্থা এমন যে যদি একবার না খাই তবে অমুক অমুক সমস্যা দেখা দেবে, এটা হবে, সেটা হবে-তাহলে এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিয়ামতকেই নিজের উপর বোঝা মনে করে, সে কীভাবে সেই সওয়াবের অধিকারী হতে পারে?

হ্যাঁ, সেই ব্যক্তি যার অন্তর এ কারণে আনন্দিত যে রমজান এসে গেছে, এবং সে এর প্রতীক্ষায় ছিল যে এটি আসবে আর আমি রোজা রাখব-কিন্তু পরে অসুস্থতার কারণে সে রোজা রাখতে পারেনি-তবে আসমানের নিকট সে রোজা থেকে বঞ্চিত নয়।

[তাফসীর মসীহ মওউদ (আ.), খণ্ড ১, নযারত নাশর ও ইশাআত কাদিয়ান কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল ২০০৪, পৃষ্ঠা ২৬২]

রমযান মাসে কুরআন মজীদের পুনরাবৃত্তি করার শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: এর তৃতীয় অর্থ এই যে, রমযান মাসেই সম্পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছিল। যেমন হাদিসে হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যু-শয্যায় হযরত ফাতিমা (রাযি.)-কে বলেছিলেন:

أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ

অর্থাৎ জিবরাইল প্রতি বছর রমযান মাসে আমার সাথে সমগ্র কুরআন একবার করে পুনরাবৃত্তি করতেন। কিন্তু এ বছর তিনি দুইবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। এ থেকে আমি বুঝতে পারছি যে এখন আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী।

(শরহ আল্লামা আয-যারকানী আলা আল-মাওয়াহিব আদ-দুনিয়্যাহ, আল-ফাসলুল আউয়াল ফি ইতমামিহি তা'আলা নি'মাতাহু 'আলাইহি বি-ফাতাহ)

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে রমযান ছাড়া অন্য মাসেও কুরআন নাযিল হয়েছে। কিন্তু রমযানুল মোবারকের বিশেষত্ব এই যে, এই মাসে যতটুকু কুরআন অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, জিবরাইল তা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মিলিত হয়ে পুনরাবৃত্তি করতেন। ভিন্ন বাক্যে বলা যায়, যেন সম্পূর্ণ কুরআন আবার আপনার উপর অবতীর্ণ করা হতো।

সহীহ বুখারীর তেও এই বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ۔

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল মানুষের চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন। আর তিনি সবচেয়ে বেশি দানশীল হতেন রমযান মাসে, যখন জিবরাইল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। জিবরাইল রমযানের প্রতিটি রাতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং সমগ্র কুরআন তাঁর সাথে মিলিত হয়ে পুনরাবৃত্তি করতেন। সেই সময়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কল্যাণ ও দানশীলতায় বৃষ্টি আনয়নকারী বাতাসের চেয়েও অধিক উদার হয়ে উঠতেন।

(তফসীরে কবীর, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৪-৩৯৫)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

ভারতের আহমদিদের জন্য উর্দু ভাষার গুরুত্ব

যদিও উর্দু ভাষার বিকাশ ত্রয়োদশ শতাব্দী খ্রিস্টাব্দেই শুরু হয়েছিল এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক, সভ্যতাগত ও ভাষাগত মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তা ভাষাগত প্রকাশের ক্ষেত্রে অসাধারণ পরিপক্বতা ও উৎকর্ষ লাভ করেছিল-এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল ও ধর্মের মানুষ তা বুঝতে সক্ষম ছিল-তবু মহান আল্লাহ তাআলা ইসলাম প্রচার ও জাতিসমূহের আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এই ভাষার মাধ্যমেই হযরত মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)-কে প্রেরণ করেন।

এই কারণে আমরা লক্ষ্য করি যে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর বক্তৃতা ও রচনাবলীর অধিকাংশই উর্দু ভাষায় রচিত। যদিও তিনি আরবি ও ফারসি ভাষাতেও বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাঁর প্রাঞ্জল ও প্রভাবশালী কাব্যরচনাও আরবি ও ফারসিতে বিদ্যমান, তদুপরি তাঁর প্রাপ্ত অধিকাংশ ওহী উর্দুর পাশাপাশি আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে; এর পরবর্তী স্থান ফারসির, এমনকি ইংরেজি ও হিন্দি ভাষাতেও কিছু ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। তথাপি তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনার বৃহত্তম অংশ উর্দু ভাষাতেই রচিত।

যদিও উর্দুর লিপি ফারসি ও আরবি লিপির অনুরূপ এবং হিন্দির লিপি সংস্কৃতভিত্তিক, তথাপি সমসাময়িক কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে হিন্দিভাষীরা উর্দু সহজেই বুঝতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান ভারতে উর্দু ও হিন্দির লিপি নিঃসন্দেহে ভিন্ন; কিন্তু কথ্য রূপে উভয়ের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বিদ্যমান যে তাদেরকে একে অপর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না। উর্দু ভাষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, আরবি ও ফারসি ভাষার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে যারা উর্দু জানে তারা সহজেই আরবি ও ফারসির প্রাচীন ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করতে পারে এবং এমনকি তা বিকশিত ও সমৃদ্ধ করতেও সক্ষম হয়-এবং বাস্তবিকই এমনটি ঘটেছে। গত তিন শতাব্দীতে ভারতে প্রকাশিত উর্দু গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই গ্রন্থগুলো মুসলমানদেরকে ইসলামের মৌলিক উৎসসমূহের নিকটবর্তী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এই প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন যে, যেহেতু হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের সংস্কার ও হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন, তাই সূরা আল-জুমুআর এই আয়াত- 'ওয়া আখারীনা লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম' (এবং তাদের মধ্যে আরও অন্যরা আছে যারা এখনো তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়নি) -এর আলোকে তাঁর দুইটি আগমন নির্ধারিত ছিল। প্রথম আগমনে হিদায়াতের পরিপূর্ণতা সাধিত হয়েছিল; কিন্তু সেই সময়ে সেই হিদায়াতকে বিশ্বব্যাপী প্রচার করার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ বিদ্যমান ছিল না। অতএব দ্বিতীয় আগমন-যা হিদায়াতের প্রচারের পূর্ণতা সাধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট-নির্ধারিত ছিল যে, যখন প্রচারের উপযুক্ত উপায়-উপকরণ উপলব্ধ হবে তখন তা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি (বুরুজে কামিল), অর্থাৎ ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহের মাধ্যমে সংঘটিত হবে। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা যে ভাষাকে নির্বাচন করেছিলেন তা ছিল উর্দু ভাষা। প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর যুগে ভারতের উর্দু ভাষা অন্যান্য ভাষার তুলনায় এমন সক্ষমতা অর্জন করেছিল যে তিনি যে গভীর ও ব্যাপক বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন তার বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক ভার বহন করতে এবং তাঁর ওপর অবতীর্ণ ঐশী বাণীগুলোকে মানবহৃদয়ে আকর্ষণীয়ভাবে পৌঁছে দিতে তা উপযুক্ত ছিল।

এই প্রসঙ্গে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) বলেন:

ওঁ য়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম' আয়াতের মর্মবাণী অনুযায়ী এবং 'কুল ইয়া আইয়ুহান নাস ইন্নী রাসুলুল্লাহি ইলাইকম জামিয়াআ' আয়াতের বক্তব্য অনুসারে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দ্বিতীয় আগমনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন রেলপথ, টেলিগ্রাফ, বাষ্পচালিত জাহাজ, মুদ্রণযন্ত্র, উন্নত ডাকব্যবস্থা, পারস্পরিক ভাষাজ্ঞান এবং বিশেষত ভারতের উর্দু ভাষা-যা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটি সাধারণ ভাষায় পরিণত হয়েছিল-এসব উপকরণ যেন নিজেদের অবস্থা দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দরবারে নিবেদন করল: 'হে আল্লাহর রসুল! আমরা সকলেই আপনার সেবায় উপস্থিত এবং প্রচারের দায়িত্ব পূর্ণ করার জন্য প্রাণপণ প্রস্তুত। আপনি আগমন করুন এবং আপনার এই দায়িত্ব সম্পূর্ণ করুন; কারণ আপনার দাবি যে আপনি সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। এখন সেই সময় উপস্থিত হয়েছে যখন আপনি পৃথিবীর সমস্ত জাতির কাছে কুরআনের বাণী পৌঁছে দিতে পারেন, প্রচারকার্যকে পরিপূর্ণতার শিখরে পৌঁছে দিতে পারেন এবং কুরআনের সত্যতার প্রমাণসমূহ সর্বত্র বিস্তার করতে পারেন।' তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আধ্যাত্মিক সত্তা উত্তর দিল: 'দেখো, আমি প্রতিচ্ছবির রূপে (বুরুজ) আসব; কিন্তু আমি ভারতের ভূখণ্ডেই আগমন করব, কারণ সেখানে বিভিন্ন ধর্মের উদ্দীপনা, সব ধর্মের সমাবেশ, বিভিন্ন মত ও সম্প্রদায়ের মুখোমুখি উপস্থিতি এবং শান্তি ও স্বাধীনতার পরিবেশ বিদ্যমান।'

(তুহফা-এ-গোলড়ভিয়া, পৃ. ১৬৪-১৬৫, কাদিয়ান মুদ্রিত)

উপরোক্ত উদ্ধৃতির আলোকে ভারতের আহমদিদের-যারা উর্দু ভাষা সম্পর্কে অবগত-দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় যে তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সেই পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবির সাহায্যকারী ও সমর্থক (সুলতান-এ-নাসির) হয়ে উঠবে, যার আবির্ভাব ভারতের ভূমিতে ঘটেছে। তাদের উচিত এই মিশনকে সর্বোতভাবে সহায়তা করা এবং ইসলাম প্রচারের আধ্যাত্মিক জিহাদে কলম, ভাষণ ও আর্থিক ত্যাগ-সব দিক থেকেই অংশগ্রহণ করা। কারণ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আধ্যাত্মিক সত্তা ইঙ্গিত দিয়েছে যে ভারতই সেই স্থান যেখানে তাঁর পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবির মিশন সাফল্য ও পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।

তদুপরি, এই প্রসঙ্গে উর্দু ভাষা বর্তমানে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে। কথ্য ভাষার বিচারে এটি ভারতের প্রায় এক ডজন প্রদেশে প্রচলিত ভাষা; কারণ হিন্দিভাষীরাও উর্দু বুঝতে ও বলতে সক্ষম। আরও একটি কারণ হলো প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর অধিকাংশ আধ্যাত্মিক বাণী ও রচনা উর্দু ভাষায় সংরক্ষিত। বর্তমান যুগে খিলাফতের খুতবা, ভাষণ ও মাজালিসে ইরফান-বিশেষত হযরত মির্জা মাসরূর আহমদ, খলিফাতুল মসীহ খামিস (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন)-এর প্রদত্ত খুতবা ও বক্তব্যসমূহও উর্দু ভাষায় উপলব্ধ।

অতএব এই আধ্যাত্মিক ভাণ্ডারসমূহ যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য-এবং যেহেতু কথ্য রূপে হিন্দি ও উর্দু প্রায় অভিন্ন-উর্দু ভাষা রপ্ত করা অপরিহার্য, বিশেষত তাদের জন্য যারা হিন্দিভাষী প্রদেশসমূহে বসবাস করেন। আধ্যাত্মিকভাবে জীবন্ত থাকার জন্য এবং জাতিকেও আধ্যাত্মিকভাবে জীবন্ত করে তোলার জন্য তারা অবিলম্বে উর্দু ভাষা শিক্ষা করে তা ব্যবহার করতে পারেন, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর বাণী অধ্যয়ন করতে পারেন এবং এভাবে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

অতএব, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আধ্যাত্মিক সত্তা এটিও নির্দেশ করেছে যে ভারত এমন একটি দেশ যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা বিদ্যমান। বাস্তবিকই এটি একটি সত্য যে অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মপ্রচার করার স্বাধীনতা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান।

উর্দু ভাষা শিক্ষার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) ১৯৯৩ সালের ২ জুলাই প্রদত্ত জুমার খুতবায় বলেন:

"আমার দ্বিতীয় উপদেশ এই যে, আপনারা উর্দু ভাষার দিকে মনোযোগ দিন। ওহীসমূহ ব্যতীত প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর অধিকাংশ রচনা উর্দু ভাষায়। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা উর্দু শিক্ষা না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর গ্রন্থসমূহে বর্ণিত গভীর আধ্যাত্মিক সত্যসমূহকে প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করতে পারবেন না। অনুবাদের মাধ্যমে কখনোই সেই সৌন্দর্য ও স্বাদ লাভ করা সম্ভব নয়, যা তাঁর মূল রচনাসমূহ পাঠ করার মাধ্যমে অর্জিত হয়।"

অতএব প্রত্যেক আহমদির কর্তব্য যে তিনি উর্দু ভাষা শিক্ষা করে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) ও খিলাফতের আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার থেকে নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করবেন এবং সত্যের পিপাসু মানুষদেরও এই জীবনদায়ী জল দ্বারা সিক্ত করবেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ali Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

১৩১ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৬ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৫, ২৬ ও ২৭ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

জুমআর খুতবা

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কখনোই এই আকাঙ্ক্ষা করেননি যে মানুষ তাঁকে নবী বলে ডাকুক বা তাঁর আনুগত্য করুক। এ কারণেই তিনি প্রায়ই একটি গুহায়–যা কবরের চেয়েও সংকীর্ণ ছিল–গিয়ে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। তাঁর কোনো ইচ্ছাই ছিল না যে তিনি সেখান থেকে বের হয়ে আসবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা নিজ ইচ্ছায় তাঁকে সেখানে থেকে বের করে আনলেন এবং তাঁর মাধ্যমে পৃথিবীতে নিজের নূর প্রকাশ করলেন।

ইবাদত আল্লাহর প্রেম ছাড়া হতে পারে না, আর আল্লাহর প্রেমও ইবাদত ছাড়া সম্ভব নয়। যদি আল্লাহ তাআলার প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা না থাকে, তবে প্রকৃত ইবাদত কখনোই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন আমাদের বিভিন্ন আদেশ দিয়েছেন, তখন তিনি শুধু কথায় সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং নিজের জীবনে তার চূড়ান্ত উদাহরণ স্থাপন করে দেখিয়েছেন। এরপর তিনি আমাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে প্রকৃত আনুগত্য ও অনুসরণ তখনই সম্পূর্ণ হবে, যখন আমরা নিজেদের সেই মানদণ্ডে উন্নীত করার চেষ্টা করব। তিনি যে দোয়াগুলো তাঁর উম্মতের জন্য করেছেন, সেগুলো তখনই আমাদের উপকারে আসবে যখন আমরা সর্বদা তাঁর আদর্শ ও নির্দেশনাকে সামনে রেখে আমল করার চেষ্টা করব। শুধু মুখে বলা বা দেখানোর মাধ্যমে কখনোই প্রকৃত ফয়েজ লাভ করা যায় না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ তাআলার ইবাদতের কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। এমনকি ঘুমের মধ্যেও তাঁর ইবাদতের রূপ বিদ্যমান থাকত।

মহানবী (সা.) শুধু উচ্চ মানদণ্ড স্থাপনই করেননি, বরং আমাদেরকেও সেই মানদণ্ড অর্জনের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি তোমরা এইভাবে চল, তবে তোমরা আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা লাভ করবে এবং তাঁর শাস্তি থেকেও রক্ষা পাবে।

আমাদের কাছে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)–এর যে উজ্জ্বল আদর্শ পৌঁছেছে, তা মূলত রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর মহান তরবিয়তের ফল। তিনি তাঁদের এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে তাঁদের ইবাদতের মান ক্রমাগত উন্নত হতে থাকে এবং আল্লাহর প্রতি তাঁদের ভালোবাসাও ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। এটাই সেই আদর্শ যা রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন, সাহাবাগণ তা গ্রহণ করেছেন, এবং আমাদের জন্যও সেই পথই অনুসরণ করার নির্দেশ রয়েছে।

আজকাল যদি কাউকে নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, কিংবা বলা হয় যে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া উচিত–তুমি কয় ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে পড়তে যাও–তাহলেই অনেকে আপত্তি করতে শুরু করে। তারা বলে, "এটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তুমি কে যে আমাদের জিজ্ঞাসা করছ? জামাআতের কেন এ ব্যাপারে প্রশ্ন করার দরকার আছে? এটা তো আমাদের আর আল্লাহর মধ্যকার বিষয়।" অথচ রসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই সাহাবাদের তাহাজ্জুদ নামাজ পর্যন্ত খোঁজ নিতেন। রসূলুল্লাহ (সা.)–এর চেয়ে অধিক স্বাধীন বা মর্যাদাবান আর কে হতে পারে? কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন দোয়া করতেন, তখন কখনো কখনো তাঁর বুক থেকে এমন শব্দ বের হতো যেন হাঁড়িতে কিছু ফুটছে। তিনি এত বেশি কাঁদতেন যে তাঁর দাড়ি পর্যন্ত ভিজে যেত।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (৬ তবলীগ, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যেমনটি বলেছেন যে, মহানবী (সা.) আমাদের জন্য 'উসওয়ায়ে হাসানা' বা সর্বোত্তম আদর্শ এবং প্র তিটি বিষয়েই তিনি সর্বে াত্তম আদর্শ। বিগত খুতবাগুলোতে এই প্রেক্ষাপটেই তাঁর (সা.) খোদাপ্রেমের বিষয় আলোচিত হচ্ছিল। খোদাপ্রেমের উল্লেখের মাঝে তাঁর ইবাদতের আদর্শের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আমার ধারণা ছিল, খোদাপ্রেমের পর পরবর্তী বিষয় হিসেবে আমি তাঁর ইবাদতের বিষয়টি গ্রহণ করব; কিন্তু যখন খোদাপ্রেমের উল্লেখ আরম্ভ হয়, তখন ইবাদত সংক্রান্ত অনেক ঘটনাও এর মধ্যে চলে আসে। ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি এই দুটি বিষয়কে আলাদা করতে পারি নি, কারণ উভয় বিষয় পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খোদাপ্রেম ছাড়া ইবাদত হয় না, আর ইবাদত ছাড়া খোদাপ্রেম সম্ভব নয়। যদি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা না থাকে, তবে প্রকৃত ইবাদত হতেই পারে না।

যাইহোক, এই প্রসঙ্গে আজ আমি আরো কিছু বর্ণনা করব; যদিও তা আমি ইবাদতের সূত্রে নিয়েছি, কিন্তু যেমনটি আমি গত খুতবাতেও বর্ণনা করেছিলাম, এর শেষ বা চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাতেই গিয়ে পৌঁছে।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) ভালোবাসার এই মানকে পবিত্র কুরআনে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, গত খুতবাগুলোতে একটি উদ্ধৃতি তথা একটি আয়াতের বরাতে আমি তার ব্যাখ্যা করেছি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন: قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (সূরা আল-আন'আম: ১৬৩) অর্থাৎ "তুমি বলে দাও, 'আমার ইবাদত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহ্ রই জন্য, যিনি সকল জগতের প্রভু '।"যেমনটি আমি বলেছি, এই আয়াতের ব্যাখ্যা তো বিগত খুতবাগুলোতে চলে এসেছে, তাই পুনরায় তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'লা এরপর তাঁকে (সা.) فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (সূরা আলে ইমরান: ৩২) ঘোষণা দিতে বলে আমাদেরকেও সেসব মান অর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মানুষকে জানিয়ে দাও– যদি তোমরা আমার অনুসরণ করো, তবে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমরা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভ করতে পারবে। অতএব, তাঁকে (সা.) এই ঘোষণা দিতে বলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও সেসব মান অর্জনের নির্দে শ দিয়েছেন যেন আমরা তা অর্জনের জন্য প্রকৃত চেষ্টা করি।

ইবাদত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাধ্যমে আমাদেরকে অসংখ্য নির্দেশনা দিয়েছেন। এক জায়গায় তিনি বলেন: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৭) অর্থাৎ "আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।" সুতরাং তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদি তোমরা আমার অনুসরণ করতে চাও, তবে শোনো– আমি যেভাবে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছি, তোমরাও তা অনুধাবন করো এবং এর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করো। তবেই তোমরা নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে সমর্থ হবে আর তবেই তোমরা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভ করতে পারবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে এক স্থানে বলেন: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (সূরা আল-বাকারা: ২২) অর্থাৎ "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রভুর ইবাদত করো যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকেও, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।"

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করা এবং তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য আবশ্যক হলো আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা এবং তাঁর ইবাদতের মানকে সুউচ্চ করা। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

(সূরা আল-হাজ্জ: ৭৮) অর্থাৎ "হে যারা ঈমান এনেছ! রুকু করো, সিজদা করো এবং তোমাদের প্রভুর ইবাদত করো ও ভালো কাজ করো, যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

সুতরাং মহানবী (সা.) যেমন আমাদেরকে এই নির্দেশাবলি প্রদান করেছেন,তেমনিভাবে তিনি নিজের আদর্শ বা কর্মের মাধ্যমে এর চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শন করেছেন এবং এরপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, প্রকৃত আনুগত্য ও অনুসরণ তখনই হবে, যখন তোমরা নিজেদেরকে সেই মানে উন্নীত করার চেষ্টা করবে। তাঁর সেসব দোয়া যা তিনি তাঁর উম্মতের জন্য করেছিলেন– তা তখনই আমাদেরকে আচ্ছাদিত করবে এবং আমাদের জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হবে, যখন আমরা তাঁর (সা.) আদর্শ ও নির্দেশাবলিকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রেখে তা পালন করার চেষ্টা করব। কেবল লোক-দেখানো ভাব এবং মৌখিক দাবিতে কোনো কল্যাণ লাভ করা যায় না।

যাইহোক, তিনি যেসব আদর্শ স্থাপন করেছেন, তন্মধ্যে অনেক দৃষ্টান্ত তো আমি উল্লেখ করেছি; আরো কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে যা এখন উপস্থাপন করছি।

তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের কোনো সুযোগ হাতছাড়া হতে দিতেন না; বরং ঘুমের মধ্যেও ইবাদত চলমান থাকত। যেমনটি তিনি নিজেই বলেছেন, "আমার চোখ তো ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ ও ইবাদত থেকে উদাসীন হয় না।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৫৬৯)

তিনি তাঁর অনুসারীদেরও এই উপদেশ দিয়েছেন যে, তোমাদের মান এমন হওয়া উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা তোমাদের দৃষ্টিপটে থাকেন। নিজের ইবাদতের বিষয়ে তিনি কতটা সূক্ষ্মভাবে আত্মজিজ্ঞাসা করতেন, সে সম্পর্কে একটি বর্ণনায় এসেছে , হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন: মহানবী (সা.) এমন একটি চাদরে নামায পড়লেন যাতে নকশা আঁকা ছিল। তিনি সেটির নকশাগুলোর দিকে একনজর দেখলেন। যখন তিনি নামায শেষ করেন তখন বলেন, "আমার এই চাদরটি আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং আবু জাহমের কাছ থেকে 'আম্বিজানি লুই' (অর্থাৎ নকশাবিহীন সাদামাটা চাদর) নিয়ে এসো। কারণ এটি এক্ষুনি নামাযে আমার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটিয়েছে।" অর্থাৎ সামান্য দৃষ্টিও যখন এর ওপর পড়ল, তখন তিনি (সা.) এটি সহ্য করতে পারলেন না যে, আমি এই চাদরটির দিকে তাকাব আর আমার মনোযোগ আল্লাহ্ তা'লার দিক থেকে সরে যাবে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "আমি আমি নামাযরত অবস্থায় এর নকশাগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম; তাই আমার আশঙ্কা হলো, এটি আবার আমাকে পরীক্ষায় না ফেলে দেয়!"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৩৭৩)

এর ব্যাখ্যায় সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওয়ালিউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব লিখেছেন, এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হলো, পোশাক-পরিচ্ছদ যেন সাদামাটা হয়। তাতে এমন চাকচিক্য যেন না থাকে যা মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দেয়। মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সাথে সাথে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অনাড়ম্বরতার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তিনি লেখেন, আজকালও আমরা দেখি, রুচিবান ব্যক্তিরা পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ রঙকে প্রাধান্য দেন। কিন্তু আজকাল এমন কিছু লোকও আছে যারা (নামাযে) নিজেদের কাপড়ের দিকে তাকাতে থাকে এবং কাপড়ের ইস্ত্রি ঠিক করার দিকে তাদের মনোযোগ থাকে। অথচ নামাযে তো পুরো মনোযোগ আল্লাহ্র প্রতি হওয়া উচিত, কোনো কাপড়ের দিকে নয়।এরপর তিনি লেখেন, নামাযে পূর্ণ একাগ্রতার প্রয়োজন রয়েছে; অর্থাৎ নামায তখনই প্রকৃত নামায হতে পারে যখন মানুষ তাতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে এবং নিবিষ্টচিত্তেনামায পড়ে। এজন্যই ইসলামের শরীয়ত আনয়কারী (সা.) নামায আদায়কারীর আশেপাশে এমন প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্বকে অপছন্দ করেছেন, যা তার মনোযোগ সেটির দিকে আকর্ষণ করে। এর দ্বারা বুঝা যায়, তিনি (সা.) কতটা গভীর মনোযোগের সাথে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করতে চাইতেন যেন এমন কোনো জিনিসের ওপর সামান্য দৃষ্টিও না পড়ে যা আল্লাহ্ তা'লার দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে দিতে পারে। আর এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (সামনে) ছবি থাকা উচিত নয়, সামনে ছবিযুক্ত কাপড় থাকা উচিত নয় এবং সামনে এমন কোনো পর্দা থাকা উচিত নয় যার ওপর ছবি আঁকা রয়েছে। কারণ এই সব জিনিস নামাযে মনোযোগ বিঘ্নিত করার কারণ হতে পারে।এজন্য এগুলো থেকে বারণ করা হয়েছে। নামায পড়ার সময় এমন কোনো পর্দা বা ছবি সামনে থাকা উচিত নয় যার দিকে মুখ ফেরালে মনোযোগ বিচ্যুত হয়। এসব জিনিস কিবলার দিকে থাকা উচিত নয়। (সহীহ বুখারী, (উর্দু অনুবাদ), ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৭৯)

একইভাবে তাঁর (সা.) উন্নত মানের (জীবনাদর্শের) আরো একটি উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত জা'ফর বিন মুহাম্মদ (রা.) নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার ঘরে মহানবী (সা.)-এর বিছানা কেমন ছিল? তিনি বলেন, তা ছিল চামড়ার, যার ভেতরে খেজুর গাছের আঁশ ভরা থাকত। হযরত হাফসা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার ঘরে মহানবী (সা.)-এর বিছানা কেমন ছিল? তিনি বলেন, তা ছিল পশমের। [অর্থাৎ জীবজন্তুর পশম দিয়ে তৈরি নরম বিছানা।] আমি সেটিকে দুভাঁজ করে বিছিয়ে দিতাম ফলে তা কিছুটা নরম হতো এবং মহানবী (সা.) তার ওপরে ঘুমাতেন। এক রাতে আমি ভাবলাম, কেন এটি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিচ্ছি না যেন এটি আরো বেশি নরম ও আরামদায়ক হয়? তাহলে এটি তাঁর (সা.) জন্য অধিক প্রশান্তির কারণ হবে। তাই আমি সেটি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিই। সকাল হলে তিনি (সা.) বলেন, তুমি রাতে আমার জন্য কী বিছিয়েছিলে? হযরত হাফসা (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, সেটি আপনারই বিছানা ছিল, আমি সেটিকে কেবল চার ভাঁজ করে দিয়েছিলাম যেন আপনার জন্য তা অধিক আরামদায়ক হয়। তিনি (সা.) বলেন, এটিকে আগের মতোই থাকতে দাও, কেননা এটির অতিরিক্ত কোমলতা রাতে আমার নামাযের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। (শামায়েলুন নবী (সা.), পৃ: ১৩৪)

যদিও নরম বিছানা তাঁর ইবাদতের পথে বাধা হওয়া সম্ভব নয়, তবুও তিনি (সা.) এমন চিন্তাও পছন্দ করেন নি যে, 'বিছানা নরম হবার কারণে আরেকটু শুয়ে থাকব এবং আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের জন্য উঠব না; আর এতে (তথা বিছানায়) আমি কোমলতা অনুভব করেছি'। এটিই ছিল তাঁর উচ্চতম মান। তাঁর ইবাদতকালীন অবস্থার চিত্র।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সওদা (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি একবার মহানবী (সা.)-এর পেছনে নামায পড়ি আর তিনি এত দীর্ঘ রুকু করেন যে, আমি নিজের নাক চেপে ধরি। [অর্থাৎ এত দীর্ঘ রুকু ছিল যে, আমার ভয় হচ্ছিল– পাছে নাক দিয়ে আবার রক্ত ঝরতে আরম্ভ করে!]

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, কিতাবুন নিসা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৯৬-১৯৭)

যাইহোক, এই অবস্থা কেবল তখনই সম্ভব যখন এমন ভালোবাসা থাকে যে, প্রিয়তমের দুয়ার ছাড়তে মানুষের মন চায় না। যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সে তাতেই নিমগ্ন হয়ে যায়।

একইভাবে ইবাদতের মান সম্পর্কে অপর একটি রেওয়ায়েত মুতাররিফ তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে এমন অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি যে, কান্নার কারণে তাঁর বক্ষ থেকে জাঁতাকল পেষার মতো শব্দ আসছিল। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৯০৪)

[অর্থাৎ যেভাবে জাঁতা বা গ্রাইন্ডার চলে, তেমন শব্দ হচ্ছিল।] অন্য এক স্থানে ফুটন্ত হাঁড়ির উদাহরণও দেওয়া হয়েছে।

(সুনান নিসাই, কিতাবুস সহু, হাদীস-১২১৪)

এরপর আরেক রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, আমি বাহনে মহানবী (সা.)-এর পেছনে বসা ছিলাম, আমার এবং তাঁর মাঝে হাওদা বা জিনের পেছনের অংশটি ছিল। তিনি বলেন, হে মু'আয বিন জাবাল! আমি বলি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি উপস্থিত এবং এটি আমার সৌভাগ্য। তারপর তিনি কিছুক্ষণ চলতে থাকেন এবং পুনরায় বলেন, হে মু'আয বিন জাবাল! আমি পুনরায় নিবেদন করি, লাব্বাইক ইয়া রসূলাল্লাহ্! এটি আমার সৌভাগ্য। এরপর তিনি কিছুক্ষণ চলতে থাকেন এবং আবারও বলেন, হে মু'আয বিন জাবাল! আমি নিবেদন করি, লাব্বাইক ইয়া রসূলাল্লাহ্, এটি আমার সৌভাগ্য। তিনি বলেন, তুমি কি জানো, বান্দার ওপর আল্লাহ্র কী অধিকার রয়েছে? আমি বলি, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি (সা.) বলেন, বান্দার ওপর আল্লাহ্র অধিকার হলো, সে যেন তাঁরই ইবাদত করে এবং কাউকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত না করে। এরপর তিনি কিছুক্ষণ চলতে থাকেন এবং বলেন, হে মু'আয বিন জাবাল! আমি বলি, লাব্বাইক ইয়া রসূলাল্লাহ্, এটি আমার পরম সৌভাগ্য। তিনি বলেন, তুমি কি জানো আল্লাহ্র ওপর বান্দার কী অধিকার রয়েছে, যখন তারা এমন করে [অর্থাৎ ইবাদতকারী বান্দা হয়]? [পূর্বে আল্লাহ্র অধিকারের কথা ছিল, এখন বান্দার কী অধিকার রয়েছে– তা বলছেন।] আমি বলি, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন, তা হলো, তিনি যেন তাদের আযাব না দেন। [অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা বান্দাদের যেন আযাব না দেন।](সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস-৩৫)

অতএব, তিনি (সা.) কেবল নিজের ব্যক্তিগত আদর্শই প্রতিষ্ঠা করেন নি, বরং সেই আদর্শ অবলম্বনের জন্য উপদেশও দিয়েছেন যে,তোমরাও যদি এমনটি করো তাহলে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাও লাভ করবে এবং আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি থেকেও রক্ষা পাবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর প্রশংসায় এক স্থানে বলেন:মহানবী (সা.) পবিত্র কুরআন প্রচারের জন্য আদিষ্ট ছিলেন, তেমনিভাবে সুন্নত প্রতিষ্ঠার জন্যও প্রত্যাদিষ্ট ছিলেন। অতএব, পবিত্র কুরআন যেমন সুনিশ্চিত, তেমনিভাবে নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে আসা সুন্নতও সুনিশ্চিত। [অর্থাৎ এমন সুন্নত, যার ধারাবাহিকতা মহানবী (সা.) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে এবং তাঁর ব্যবহারিক আমল দ্বারা সাব্যস্ত হয় এবং মুতাওয়াতের তথা বর্ণনাকারীরা ধারাবাহিকভাবে তা বর্ণনা করে আসছেন, রেওয়ায়েতের একটি শৃঙ্খল বিদ্যমান।] এই উভয় সেবা মহানবী (সা.) নিজ হাতে সম্পাদন করেছেন এবং উভয়টিকে নিজের জন্য অবশ্য কর্তব্য জ্ঞান করেছেন। যখন নামাযের আদেশ হলো, তখন মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার এই বাণী নিজের কর্ম দ্বারা বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন এবং ব্যবহারিকভাবে দেখিয়ে দেন যে, ফজর নামায এই কয় রাকআত আর মাগরিবের এত এবং অন্যান্য নামায এত রাকআত। একইভাবে হজ্জ পালন করেও দেখিয়ে দেন এবং এরপর নিজের হাতে হাজার হাজার সাহাবীকে এই কার্যে অভ্যস্ত করে ব্যবহারিক কর্মের ধারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রতিষ্ঠিত করেন। [নিজে করে দেখান, এরপর তাদেরকে এই বিষয়ে অভ্যস্তও করেন।] কাজেই, যে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত আজ অবধি উম্মতের মাঝে অনুসৃত কর্মপন্থা হিসেবে দৃশ্যমান ও প্রতীয়মান, এরই নাম সুন্নত। তিনি (আ.) আরো লেখেন, কিন্তু হাদীস মহানবী (সা.)-এর সামনে লেখা হয় নি এবং তা সংকলন করার জন্য (সে সময়) কোনো বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি।

যাইহোক, তিনি (আ.) সুন্নত ও হাদীসের মাঝে তুলনা করছিলেন যে, এই দুয়ের মাঝে পার্থক্য কী। তিনি (আ.) বলেন, সুন্নতের স্থান আগে এবং হাদীসের স্থান পরে; আর যে হাদীস পবিত্র কুরআন এবং তাঁর সুন্নতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সেই হাদীস সহীহ্ বা সঠিক। (রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ২০১০-২১২)

অতএব, যেখানে তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর প্রশংসায় একথা বলছেন যে, তাঁর ইবাদতের মান কেমন ছিল, সেখানে এটিও বলে দিয়েছেন যে, তিনি (সা.) এসব কিছু করে দেখিয়েছেন এবং নিজের অনুসারীদের এগুলোর ওপর আমল করার উপদেশ দিয়েছেন এবং তাঁদের দিয়ে আমল বা অনুশীলনও করিয়েছেন। অতএব, এটিই সেই সুন্নত যা আজ অবধি আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

সাহাবীদের যে আদর্শ আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা মহানবী (সা.)-এর তরবিয়তের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে। তিনি (সা.) সাহাবীদের এমন তরবিয়ত করেছেন যে, তাঁদের ইবাদতের মানও উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে থেকেছে এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁদের ভালোবাসার মানও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থেকেছে। এটিই সেই আদর্শ যা তিনি (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা তাঁর সাহাবীরা অবলম্বন করেছেন আর আমাদের জন্যও এটিই নির্দেশ। তিনি (সা.) তাহাজ্জুদ সম্পর্কে অনেক তাগিদ দিয়েছেন, তাহাজ্জুদ পড়া উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর তফসীরে এক স্থানে লিখেছেন, মহানবী (সা.)-এর এসব নফলের প্রতি এতটাই খেয়াল ছিল যে, নফল হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাতে ঘুরে ঘুরে দেখতেন, সাহাবীদের মধ্যে কারা এই নফল পড়ছে। [অর্থাৎ শহরের অলিগলি এবং রাস্তাঘাটে ঘুরতেন, তখন বুঝতে পারতেন কোথা থেকে নামাযের শব্দ ভেসে আসছে, তাহাজ্জুদের সময় কারা জেগেছে এবং কারা পড়ছে না।] অর্থাৎ তিনি এই বিষয়েও খোঁজ নিতেন যে, কে তাহাজ্জুদ পড়ছে আর কে পড়ছে না।

আজকাল যদি কাউকে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় বা এটিই বলা হয় যে, 'মসজিদে গিয়ে নামায পড়া উচিত, মসজিদে কয় বেলা নামাযে আসো'- তখন এতে মানুষের আপত্তি করা শুরু হয়ে যায় যে, 'এটি আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার; আমাদেরকে জিজ্ঞেস করার তোমরা কে? এই প্রশ্ন করার জামা'তের কী প্রয়োজন? এটি আমাদের এবং আল্লাহ্ তা'লার বিষয়'। কিন্তু মহানবী (সা.) তো স্বয়ং তাহাজ্জুদ নামাযেরও তদারকি করতেন।

একবার তাঁর বৈঠকে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-র উল্লেখ করা হয় যে, তিনি খুব ভালো এবং তার মাঝে অমুক অমুক গুণ রয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, সে ভালো মানুষ বটে, শুধু যদি তাহাজ্জুদ পড়ত! তিনি যেহেতু যুবক ছিলেন এবং তাহাজ্জুদে অলসতা করতেন সেজন্য তিনি (সা.) তাকে এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সেই দম্পতির প্রতি দয়া করুন, যদি রাতে স্বামীর ঘুম ভাঙে তাহলে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং স্ত্রীকেও জাগায় যে, 'তুমিও উঠে তাহাজ্জুদ পড়'। যদি সে না ওঠে তাহলে তার মুখে পানির ছিটা দেয় এবং জাগায়। একইভাবে যদি স্ত্রীর ঘুম ভাঙে তাহলে সে নিজেও তাহাজ্জুদে পড়ে এবং স্বামীকেও জাগায়। আর যদি সে না ওঠে তাহলে তার মুখে পানির ছিটা দেয়। লক্ষ্য করে দেখো, একদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্ত্রীর জন্য স্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন অত্যন্ত জরুরি আখ্যায়িত করেছেন, অন্যদিকে তাহাজ্জুদে জাগানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনে পানির ছিটা দিতে হলে সেটাকেও বৈধতা দিয়েছেন। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাহাজ্জুদ নামাযকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।

পবিত্র কুরআন বলে, রাতে ওঠা আত্মাকে সুশৃঙ্খল করে। এই কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদেরকে বলতেন, যদি দুই রাকআতও হয় তবুও তাহাজ্জুদঅবশ্যই পড়। হাদীস থেকে এটিও প্রমাণিত, রাতের শেষ অংশে আল্লাহ্ তা'লা নিকটবর্তী হয়ে যান এবং অনেক বেশি দোয়া গ্রহণ করেন। এজন্য তাহাজ্জুদ পড়া অত্যন্ত জরুরি ও খুবই উপকারী।

(হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) রচিত সীরাতুন নবী (সা.), ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৬-৪১৭)

এতে সন্দেহ নেই যে, খোদা তা'লার অনুগ্রহের ফলেই নাজাত (মুক্তি) লাভ হয়। কোনো ব্যক্তি নিজ কর্মের ভিত্তিতে দাবি করতে পারে না যে, সে মুক্তি পাবে। কেননা, সবচেয়ে বড়ো ধার্মিক এবং খোদার সবচেয়ে অনুগত ছিলেন মুহাম্মদ (সা.)। তিনিও নিজের কর্মের ওপর ভরসা করতেন না। যেভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং গত খুতবাতেও বর্ণনা করেছি, রসূলু ল্লাহ্ (সা.) হযরত আয়েশা (রা.) এবং অন্য আরো সাহাবীদেরকেও এটিই বলেছেন, যখন তারা জিজ্ঞেস করেছে যে, আপনি তো নিজ আমলের কল্যাণে বেহেশতে যাবেন। তখন তিনি (সা.) বলেছেন, না, আয়েশা! আমিও খোদার অনুগ্রহেই যাব। সুতরাং যখন মুহাম্মদ (সা.)-এর ন্যায় মানুষ, যাঁর প্রতিটি নিশ্বাস, যাঁর চলাফেরা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাঁর নিদ্রাযাপন ও জাগ্রত হওয়া ইবাদত গণ্য হতো, যাঁর প্রতিটি গতি ও স্থিতি ইবাদত ছিল, এমনকি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাওয়া এবং স্ত্রীদের কাছে যাওয়াও ইবাদত ছিল; এত বড়ো ইবাদতকারী মানুষ যখন বলেন, 'আমিও নিজের কর্মের ফলে বেহেশতে যাব না বরং খোদার অনুগ্রহে যাব'- তাহলে আর কে রয়েছে যে বলতে পারে, 'আমি নিজ কর্মবলে বেহেশতে প্রবেশ করব'? এটা মনে কোরো না যে, রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর প্র তিটি কাজ কীভাবে ইবাদতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এটা এভাবে, কেননা তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা এটি বলে দিয়েছেন, তাঁর প্রতিটি অবস্থা ইবাদত ছিল। অজ্ঞ ব্যক্তি বলতে পারে, মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি কাজ কীভাবে ইবাদত হয়ে গেল? কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত- এটি একেবারে সঠিক কথা যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিটি কাজ ইবাদত ছিল। তবে তিনি (সা.) ব্যতীত আর কারো প্রতিটি কাজ ইবাদত হতে পারে না। তিনি (সা.) 'উসওয়ায়ে হাসানা' তথা সর্বোত্তম আদর্শ। এজন্য তাঁর প্রতিটি কাজ খোদার সন্তুষ্টির জন্য ছিল। আর যে কাজ খোদার সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে সেটি ইবাদতে পরিণত হয়। অন্য কারো প্রতিটি কাজ ইবাদত হতে পারে না। মহানবী (সা.) সম্পর্কে খোদা বলেছেন, لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ- (সূরা আহযাব: ২২) তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতিটি কাজে একটি আদর্শ রয়েছে। এর অর্থ কি এটি নয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের কর্ম দ্বারা বলে দেবেন যে, কোন কাজটি বৈধ এবং কোনটি অবৈধ, কোনটি পছন্দনীয় আর কোনটি অপছন্দনীয়, কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম? সুতরাং রসূল করীম (সা.)-এর প্রতিটি কাজই একটি বিবরণ। যেমন তাঁর (সা.) নামায পড়া শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার একটি আদেশ পালনই ছিল না বরং এই কথার ঘোষণা ছিল যে, এগুলো হচ্ছে ফরয আর এগুলো হচ্ছে সুন্নত, আর এগুলো হচ্ছে নফল যা ফরযের বাহিরে অতিরিক্ত নামায আর যে নামাযগুলো আদায় করা খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য আবশ্যক। তাঁর (সা.) খাবার খাওয়া এই কথার ঘোষণা ছিল যে, তিনি (সা.) যা কিছু খেতেন তা হালাল আর যে জিনিসগুলো তিনি (সা.) খেতেন না তা খাওয়ার অনুপযুক্ত। সুতরাং রসূল করীম (সা.)-এর প্রতিটি কাজকে যেহেতু মানুষের জন্য আদর্শ বানানো হয়েছিল, তাই তিনি (সা.) যে জিনিসগুলোকে বৈধ আখ্যা দিতেন এবং ব্যবহার করতেন তা ইবাদত ছিল। অনুরূপভাবে যেগুলো সম্বন্ধে নিষেধ করতেন এবং নিজেও সেগুলো ব্যবহার করতেন না তা-ও ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোটকথা, তাঁর (সা.) প্রতিটি কাজই ছিল ইবাদত, কেননা সেগুলো খোদা তা'লার নির্দেশের অধীন ছিল। এর একটি উদাহরণ হলো, একবার এক ব্যক্তি আসরের নামাযের সময় জিজ্ঞাসা করল। একথা স্পষ্ট যে, প্রথম সময়ে নামায পড়া পছন্দনীয়, কিন্তু রসূলু ল্লাহ্ (সা.) নামায পড়তে এত দেরি করলেন যে, নামাযের সময় খুবই কম অবশিষ্ট ছিল। তাঁর (সা.) নামাযের ক্ষেত্রে এই দেরি করাও একটি ইবাদত ছিল। তা কেন? তা এই জন্য যে, তিনি (সা.) এর মাধ্যমে এই শিক্ষাই দিচ্ছিলেন যে, কোনো মানুষ যদি কখনও কোনো কারণে প্রথম সময়ে নামায পড়তে না পারে আর সে যদি শেষ সময়ের ভেতরও নামায পড়ে নিতে পারে, তাহলেও তার নামায হয়ে যাবে। মোটকথা, তাঁর (সা.) ফরয নামায, ওয়াজিব নামায এবং নফল ও সুন্নত নামাযসমূহেও এই ঘোষণা ছিল যে, এগুলো সবই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত। এই অবস্থা সত্ত্বেও তিনি (সা.) বলেছেন, তিনিও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহেই বেহেশতে যাবেন। অর্থাৎ তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা এ কথা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর সকল আমলই ইবাদত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি (সা.) এটিই বলেছেন যে, আমি তো আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের কল্যাণেই বেহেশতে যাব। তাহলে আমরা- যাদের আমল এতো নগণ্য- তারা এ কথা কীভাবে বলতে পারি যে, আমরা আমাদের আমলের মাধ্যমে বেহেশতে চলে যাব? এর মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অনুগ্রহ কতটা জরুরি বিষয়।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহও কেবল দাবির মাধ্যমে লাভ হতে পারে না। এটি লাভ করার জন্যও কিছু বিষয় প্রয়োজন। শুধুমাত্র ঈমানের দাবি করলেই কিছু হয় না। আর (অনুগ্রহ লাভের) সেই বিষয়টি কী? সেটি হচ্ছে আমল। মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের ওপর আমল করা বা আমল করার চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা, নিজের ইবাদতের মান উঁচু করার চেষ্টা, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভ করার চেষ্টা। এটি তখনই হবে যেভাবে

আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে, ইবাদত খোদাপ্রেম ব্যতীত নয় আর খোদাপ্রেমও ইবাদত ব্যতীত নয়। (খুতবাতে মাহমুদ, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১১১-১১২)

রসূল করীম (সা.)-এর দোয়ার মান বা অবস্থা কেমন ছিল এ সম্পর্কেও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর তফসীরের এক স্থানে লিখেছেন; [কিছু অংশ আমি নিজের ভাষায় বলব, তবে সেগুলোও সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছে;] তিনি (রা.) বলেন:

এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা দোয়া করে বটে, কিন্তু তাদের চোখ, তাদের মন, তাদের মস্তিষ্ক এবং তাদের হৃদয় তাদের দোয়ার সাহায্যকারী হয় না। তারা দোয়া করে ঠিকই কিন্তু তাদের চোখ অন্য কোথাও থাকে, তাদের মন অন্য কোথাও থাকে, তাদের মস্তিষ্ক অন্য কোথাও ঘুরে বেড়ায়, তাদের হৃদয়ে সেই ভালোবাসা থাকে না যা থাকা প্রয়োজন। খোদা তা'লার জন্য সেই ভালোবাসা থাকে না। আর এর পরিণাম বা ফলাফল কী হয়ে থাকে? এর ফলাফল এটিই হয়ে থাকে যে, যেহেতু এই বিষয়গুলো তাদের দোয়ার সাথে সাথে ক্রিয়াশীল থাকে না বা সেটিকে সাহায্য করে না, তাই সেই দোয়া কেবল এক কৃত্রিম দোয়াই হয়ে থাকে। তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয় না, তাদের হৃদয় বিগলিত হয় না। দোয়া করার সময় তো চোখ অশ্রুসিক্ত হওয়া উচিত, হৃদয় বিগলিত হওয়া উচিত, মনমস্তিষ্ক একাগ্রচিত্তে খোদা তা'লার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। আর তাদের বক্ষ যতক্ষণ সেই উদ্দীপনার সাথে টগবগ না করে ততক্ষণ সেই দোয়ার ফলাফল এটিই দাঁড়ায় যে, তাদের দোয়া সেভাবেই বাতাসে উড়ে যায় যেভাবে ধুলোবালি বাতাসে উড়ে যায়।

রসূল করীম (সা.)-এর চেয়ে বেশি স্বাধীনচেতা এবং তাঁর চেয়ে বেশি সম্মানিত আর কে হতে পারে? কিন্তু তাঁর সম্পর্কেও এটি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) যখন দোয়া করতেন তখন অনেক সময় তাঁর বক্ষ থেকে এমন শব্দ বের হতো যেন কোনো হাঁড়িতে ফুটন্ত পানি টগবগ করছে। তিনি (সা.) এত বেশি কাঁদতেন যে, তাঁর পবিত্র দাড়ি ভিজে যেত।

কিন্তু অনেক মানুষ আছে, যারা নিজেদের অভ্যাস অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লার সাথেও অহংকার করে এবং দোয়ার সময় ক্রন্দন করাকে অপছন্দ করে।

(সীরাতুন নবী (সা.) প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৯)

নামাযের মাঝে হৃদয়ের ব্যাকুলতা সৃষ্টি হওয়াও আবশ্যক। এর জন্যও মানুষের চেষ্টা করা উচিত। এ বিষয়েই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি উপায়ও বাতলে দিয়ে বলেছেন, নিজের চেহারায় কান্না-কান্না ভাব নিয়ে আসো; এই বাহ্যিক অবস্থাও অন্তরে প্রভাব ফেলে এবং তখন মানুষ সত্যিই কাঁদতে আরম্ভ করে। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৯)

সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সা.)একদিকে যেমন আমাদের জানিয়েছেন যে, এ হলো আমার ইবাদতের মানদণ্ড এবং আমি কৃতজ্ঞ বান্দা; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহই আমাকে রক্ষা করবে এবং সেই অনুগ্রহ লাভের জন্য আমি ইবাদতও করি এবং আল্লাহ্‌র নিয়ামতের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তো অমুখাপেক্ষী। আমি যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করি, তবে কে জানে-আল্লাহ্ তা'লা কী আচরণ করবেন! অতএব যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মতো ব্যক্তি, যিনি সকল পুণ্যবান মানুষের নেতা, স্বয়ং তিনিও আমলের অমুখাপেক্ষী নন, তখন অন্যরা কীভাবে অমুখাপেক্ষী হতে পারে? আর তারা কীভাবে বলতে পারে যে, 'আমরা আমলের আবশ্যকতা থেকে মুক্ত হয়ে গেছি, আমাদের আমলের দরকার নেই; আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করে দেবেন'? এ তো কাফিরদের কথা, মু'মিনদের কথা নয়।

(সীরাতুন নবী (সা.) প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮৩)

যিকরে ইলাহীও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর একটি সুন্নত।

তিনি নিয়মিত যিকরে ইলাহী (তথা আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ) করতেন। এ বিষয়ে এক খুতবায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) উল্লেখ করেছেন, যিকরসমূহের মধ্যে এটিও অন্যতম যা ঘুমানোর সময় পড়া হয়। মহানবী (সা.) ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস-কুরআন করীমের শেষ এই তিনটি সূরা তিনবার পাঠ করে হাতের ওপর ফুঁ দিতেন এবং সেই হাত নিজের শরীরে বোলাতেন। তিনি হাতের ওপর ফুঁ দিয়ে এমনভাবে শরীরে বোলাতেন যে, মাথা থেকে শুরু করে যতদূর পর্যন্ত হাত পৌঁছাত, ততদূর পর্যন্ত বোলাতেন। এটি তাঁর (সা.) সুন্নত। যে কাজকে তিনি (সা.) ধর্মীয় কাজ জ্ঞান করে নিয়মিত ও সর্বদা করতেন সেগুলোকেই সুন্নত বলা হয়।

যেহেতু এই যিকরও তিনি নিয়মিত করতেন, অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী ও তিনটি 'কুল' (ইখলাস, ফালাক, নাস) রাতে পড়া- তাই এই সুন্নতের অনুসরণ প্রত্যেক মুসলমানেরই করা উচিত; বরং এটিকে নিজ জীবনের অপরিহার্য অংশ বানানো উচিত। অতএব এটি ভেবে যিকর ত্যাগ করা উচিত নয় যে, 'এটি তেমন জরুরি নয়, এটিনা করলে জাহান্নামে যেতে হবে না'। আবার এ ধারণা করাও ঠিক নয় যে, 'এই যিকরই জান্নাতে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট, এর সাথে আর কোনো আমলের প্রয়োজন নেই'।

যে ফরযসমূহ রয়েছে সেগুলোও পূর্ণ করতে হবে। আমাকেও অনেকে চিঠি লেখেন এবং জিজ্ঞেস করেন, আমাদের জন্য কোনো ছোট্ট দোয়া বলে দিন, কোনো যিকর বলে দিন যা আমরা নিয়মিত করতে থাকব, যেন আমাদের ভেতর পুণ্য সৃষ্টি হয়, আমাদের পাপ দূর হয়ে যায়, আমাদের কাজকর্ম ও সহজ হয় এবং আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যও লাভ করতে পারি। এর উত্তরে প্রথম কথা হলো ইবাদত, অর্থাৎ ফরয নামায। সেগুলোর পাশাপাশি রসূলুল্লাহ্ (সা.) ফরযের পর নফল নামাযও আদায় করতেন। অতএব, নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে হাজির হবার যে মানদণ্ড রয়েছে, তা আগে অর্জন করা প্রয়োজন। এরপর রয়েছে নফল ইবাদত, তারপর যিকরে ইলাহী। যিকর মানুষকে আরো বেশি পুণ্যের দিকে মনোযোগী করে তোলে, কিন্তু এর পাশাপাশি অন্যান্য নৈতিক গুণাবলি ও সৎকর্ম পালনও অপরিহার্য। মানুষের উচিত উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া। আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য লাভ, নিজের সমস্যার সমাধান এবং দোয়া কবুল হবার জন্য আবশ্যক হলো আল্লাহ্ তা'লার সব আদেশ পালন করা, আর সেই আমল এমনভাবে করা যেভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের করে দেখিয়েছেন। এজন্য আন্তরিক চেষ্টা করা উচিত এবং এই পূর্ণাঙ্গ সুন্নতের ওপর আমল করা উচিত।

যাইহোক, যিকরের বিষয়ে এই মনোভাব থাকা উচিত নয় যে, যিকর পরিত্যাগ করলে কেউ জাহান্নামে যাবে অথবা যিকরই কাউকে জান্নাতে নিয়ে যাবে অথবা এর মাধ্যমে আমাদের সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। মোটকথা আমল আবশ্যক এবং ফরয কাজগুলো পালনও আবশ্যক।

যেক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর ন্যায় মহামানব নিজ (আধ্যাত্মিক) উন্নতির জন্য এসব যিকরের মুখাপেক্ষী ছিলেন সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে একথা বলতে পারি যে, আমাদের এসব যিকরের প্রয়োজন নেই?

মহানবী (সা.)-এর সুন্নত হলো, তিনি সদা ঘুমোনোর সময় আয়াতুল কুরসী এবং তিন কুল (সূরা এখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস) তিনবার করে পাঠ করতেন- যেমনটি একটু আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, আর এরপর হাতে ফুঁ দিয়ে শরীরে হাত বোলাতেন। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১১, পৃ: ১৯-২১)

হযরত মসুলেহ্ মাওউদ (রা.) আরো কিছু বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, যারা ধর্মীয় নেতা হন তাদের এই প্রবল খেয়াল থাকে যেন তাদের ইবাদত ও যিকর অন্য মানুষের তুলনায় বেশি হয়। ধর্মের কিছু এমন নেতাও আছেন যারা আলেম বা ধর্মীয় সংগঠনের প্রধান হিসেবে পরিচয় দেয়; তারা মনে করে, 'আমাদের ইবাদত অন্যদের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত' এবং এজন্য তারা বিশেষভাবে কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয় যেন মানুষ তাদের পুণ্যবান মনে করে। বড়ো বড়ো নেতা ও রাজনীতিবিদরাও এখন এটাই করতে শুরু করেছে, তাদের হাতে তসবিহ থাকে; মসজিদের ইমাম বা কোনো সংগঠনের পদাধিকারীগণ নিজেদেরকে জগতের জন্য আদর্শ মনে করে অথবা এটা বুঝাতে চায় যে, 'আমরা তোমাদের জন্য আদর্শ'। তারা মনে করে, তারা যেহেতু আদর্শ, তাই তারা লোক-দেখানো কৃত্রিমতা করে এবং বাহ্যিকভাবে এমন আচরণ প্রকাশ করে। মুসলমানদের মধ্যেও এই বিষয়গুলো আছে এবং অমুসলিম নেতাদের মধ্যেও তা দেখা যায়। কিছু গোত্রীয় প্রথাতেও এসব কথা পাওয়া যায়। যা-ই হোক, যদি মুসলমান হয় তবে তাদের নিজেদের জাহির করার বা নিজেদের অবস্থা প্রদর্শন করার ধরন এমন যে, যদি তারা অজু করে তবে বিশেষ আয়োজনের সাথে দীর্ঘক্ষণ ধরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধুতে থাকে; এমনকি এটাও বলে যে, অজু করার সময় যে পানির ফোঁটা পড়ছে তা-ও যেন শরীরে না লাগে, কারণ এতে অপবিত্রতা সৃষ্টি হয়; তারা সিজদা ও রুকুও অনেক লম্বা করে এবং কেবল দেখানোর জন্য নিজেদের অবয়ব দিয়ে বিনয় ও নম্রতার ভাব প্রকাশ করে। যদি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা পাবার জন্য করে থাকে তবে তা ভিন্ন কথা, কিন্তু এরা দুনিয়াকে দেখানোর জন্য এসব করে থাকে; মানুষের সামনে খুব দোয়া-দরূদ পড়বে, হাতে তসবিহ থাকে এবং প্রকাশ্য যিকর করতে থাকে; অথচ মহানবী (সা.) সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী ও পরহেযগার হওয়া সত্ত্বেও এবং কোনো মানুষ তাঁর সমপরিমাণ খোদাভীতি অর্জন করতে না পারা সত্ত্বেও তিনি (সা.) এসব বিষয়ে অত্যন্ত অনাড়ম্বরছিলেন এবং তাঁর জীবন এই সব লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

হযরত আবু কাতাদা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি অনেক সময় নামাযে দাঁড়াই এবং ইচ্ছা হয়- নামায দীর্ঘ করব; কিন্তু (ইতোমধ্যে) কোনো শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই, তখন আমি আমার নামায এই ভয়ে সংক্ষিপ্ত করে দিই যে, পাছে আমি শিশুটির মাকে কষ্টে ফেলে দিই। কত-না সরলতার সাথে মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি শিশুর আওয়াজ শুনে নামায দ্রুত শেষ করে ফেলি। আজকালকার সুফিরা তো এহেন উক্তিকে সম্ভবত নিজেদের মানহানি বলে মনে করবেন। তারা তো এ কথা প্রকাশ করার মাঝে নিজেদের গর্ব মনে করেন যে, আমরা নামাযে এমন মগ্ন থাকি যে কোনো খবরই থাকে না এবং যদি পাশে ঢোলও বাজতে থাকে তবুও আমাদের কোনো খেয়াল হয় না; অথচ মহানবী (সা.) এসকল লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁর (সা.) শ্রেষ্ঠত্ব ছিল আল্লাহ্ তা'লার দানকৃত, মানুষ তাঁকে সম্মানিত বানায় নি। মানুষের কাছ থেকে তাঁর কিছুই পাওয়ার ছিল না। তিনি খোদা তা'লার কাছ থেকে সম্মানের প্রত্যাশী ছিলেন। তাই তিনি (সা.) এসব বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন; এসব (লোক-দেখানো) চিন্তা তারাই করতে পারে যারা মানুষের দেওয়া সম্মানকে প্রকৃত সম্মান মনে করে। এই প্রদর্শনপ্রিয়তা কেবল সেসব লোকেরই হতে পারে যারা মানুষকে সম্মানদাতা মনে করে। যারা আল্লাহ্

তা'লাকে প্রকৃত সম্মানদাতা মনে করে, তারা কখনোই এমন চিন্তা করতে পারে না, যেমনটি মহানবী (সা.) সুন্নত কায়েম করেছেন এবং নিজের আমল দ্বারা প্রকাশ করেছেন। তাদের মাঝে সরলতা থাকে এবং থাকা উচিত।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, একবার তাকে অর্থাৎ হযরত আনাসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মহানবী (সা.) কি জুতোসহ নামায পড়তেন? এখন একপাশে ইবাদতসমূহ রয়েছে এবং উচ্চমান অর্জন করার বিষয়টি রয়েছে, কিন্তু যেখানে সহজসাধ্যতার প্রয়োজন সেখানে সাচ্ছন্দ্যও আছে। যেমন আমি আসরের নামাযের সময়ের ব্যাপারে বলেছি যে, মহানবী (সা.) প্রতিটি দিক সামনে রাখতেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত যেন দৃষ্টিপটে থাকে ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য যেন সামনে থাকে। যাহোক, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মহানবী (সা.) কি জুতোসহ নামায পড়তেন? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তিনি পড়তেন। এই ঘটনা থেকে জানা যায়, তিনি কীভাবে লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা থেকে বেঁচে চলতেন। যেসব মুসলমান ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে অনবগত, বরং এর শিক্ষা সম্পর্কেই অজ্ঞ, তারা যদি কাউকে জুতোসহ নামায পড়তে দেখে তবে শোরগোল শুরু করে দেবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাদের ধারণা অনুযায়ী সকল শর্ত পূরণ না করে ততক্ষণ তারা সহ্যও করতে পারে না। অথচ মহানবী (সা.) আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ; তাঁর পদ্ধতি ছিল, তিনি বাস্তব অবস্থাকে দেখতেন; লৌকিকতার পূজারী ছিলেন না। অবস্থা তো আজও এমনটিই। আমাদের জনৈক আহমদী আমাকে লিখেছে, তাকে একজন (অআহমদী) বলে যে, 'তুমি কলেমা পড়ছ' বা 'তুমি অমুক কথা বলেছ'; সে (তথা আহমদী) বলে, 'তুমি তো নামাযই পড় না! তুমি নামাযও পড়তে জানো না কিংবা তুমি কুরআনও পড় না।তুমি এসবের কী বুঝবে? তোমার এসবের সাথে কী সম্পর্ক?' সে বলে, 'আমি (নামায) জানি বা না-ই জানি, কিন্তু তুমি যেহেতু আহমদী, মির্যায়ী বা কাদিয়ানী, তাই তোমার নামায পড়া উচিত নয় এবং তোমার নামায জানাও উচিত নয়'।অতএব এটি আজকালকার মানুষের অবস্থা; তারা আমাদের বিরোধী, কিন্তুনিজেদের কোনো আমল নেই। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের জন্য পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা শর্ত এবং এ কথা কুরআন করীম ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অতএব, যে জুতো পবিত্র এবং যা পরে অপবিত্রতা লাগার আশঙ্কাপূর্ণ সম্ভাব্য জায়গাগুলোতে যাওয়া হয় নি, প্রয়োজনে তা পরে নামায পড়ায় দোষের কিছু নেই। আর তিনি (সা.) এমনটি করে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ওপর এক বিশাল অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তাদের এই উত্তম আদর্শ থেকে উপকৃত হওয়া উচিত, যারা আজকাল এসব বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে এবং লৌকিকতার ভক্ত।

যে কাজের ফলে আল্লাহ্‌র মহিমা এবং তাকওয়ার কোনো ঘাটতি হয় না, তা করলে মানুষের ধার্মিকতার ক্ষেত্রে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১২, পৃ: ৫১৭-৫১৯)

তারপর ইকামাতে সালাত বা নামায প্রতিষ্ঠাও একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয় এবং এর মধ্যে নিজে নামায পড়া, অন্যদের পড়ানো এবং নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে পড়া, অজু অবস্থায় ধীরস্থিরভাবে বাজামা'ত এবং পূর্ণ শর্তাবলি মেনে নামায পড়া অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নামায আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে সাক্ষাতের একটি মাধ্যম, যেন এর মাধ্যমে ঐশ্বরিক সেই রঙ যা মহানবী (সা.)-এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করতে চান, তা মু'মিনদের মাঝে সৃষ্টি হয় এবং যেন তারা আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন হয়ে যায়।

মহানবী (সা.) বাজামা'ত নামাযের বিষয়ে এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে, একবার তাঁর কাছে একজন অন্ধ ব্যক্তি আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমার বাড়ি মসজিদ থেকে অনেক দূরে এবং যেহেতু মসজিদে পৌঁছাতে আমার অনেক কষ্ট হয়, তাই আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি বৃষ্টির দিনগুলোতে নিজের বাড়িতেই নামায আদায় করে নিতে পারি। মদীনায় মাটির ঘর ছিল, বৃষ্টির কারণে অলিগলিতে পানি জমে যেত এবং ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে চলতে হতো; কিন্তু সেখানে দেয়ালকে বৃষ্টির পানি থেকে বাঁচানোর জন্য এই প্রথা ছিল যে, দেয়ালের সাথে পাথর গেঁথে রাখা হতো যেন বৃষ্টির পানি দেয়ালে লেগে কাঁচা দেওয়ালের ক্ষতি করতে না পারে। অন্ধ সাহাবী বলেন, আমি পানির কারণে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলতে পারি না, আর কিনার দিয়ে চললে আমি যেহেতু দেখতে পাই না, সেহেতু সেখানে পায়ে পাথরের আঘাত লাগার, আহত হওয়া বা পড়ে যাওয়ার ভয় আছে; তবে কি আমি বাড়িতে নামায আদায় করে নেব? মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে, পড়তে পারো; যদি তোমার এই সমস্যা থাকে তবে কোনো ক্ষতি নেই। তিনি যখন সেখান থেকে চলে গেলেন, তখন কিছুক্ষণ পর তিনি (সা.) সাহাবীদের বলেন, তাকে একটু ডেকে নিয়ে এসো। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, তোমার বাড়িতে কি আযানের আওয়াজ পৌঁছায়? তিনি নিবেদন করেন, জি হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আযানের আওয়াজ তো পৌঁছে যায়। তখন তিনি (সা.) বলেন, যদি আযানের আওয়াজ তোমার ঘরে পৌঁছায় তবে মসজিদে আসার সময় যদি হোঁচট খেতে হয় কিংবা আহত হতে হয়, তবুও তোমার অবশ্যই মসজিদে আসা উচিত। (তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২৩-২৫)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি আবারও বলছি, আল্লাহ্‌র ভালোবাসার বৃক্ষসমূহ তাদের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তাতে এমন সুমিষ্ট ও পবিত্র ফল ধরবে যা 'উকুলুহা দায়িমুন' (অর্থাৎ তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী)-এর প্রতিচ্ছবি হবে। মনে রেখো, এটিই সেই স্তর যেখানে সুফিদের আধ্যাত্মিক ভ্রমণের (সুলুক) পরিসমাপ্তি ঘটে; যখন কোনো পথিক (সালেক) এখানে পৌঁছায়, তখন সে কেবল খোদারই জ্যোতি প্রত্যক্ষ করে।

তিনি (আ.) বলেন, 'তাআব্বুদ'-এর অবস্থা তথা ইবাদতের অবস্থার সংশোধন বা যথার্থতাই হলো প্রকৃত ইবাদত। এমন অবস্থা যেখানে আল্লাহ্ তা'লার কথাস্মরণ থাকে এবং তাঁর ইবাদত করার সময় আল্লাহ্ তা'লাই সামনে থাকেন, সেটিই হলো প্রকৃত ইবাদত। তিনি বলেন, إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَّبَشِيرٌ (সূরা হুদ: ৩) অর্থাৎ "আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যেহেতু এই 'তাআব্বুদে তাম' তথা পূর্ণাঙ্গীণভাবে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করার কাজ এক অতি মহান কাজ,মানুষ কোনো উত্তম আদর্শ এবং নিখুঁত নমুনা ছাড়া এটি করতে পারে না, কোনো পবিত্রকরণ শক্তির পূর্ণ প্রভাব ছাড়া কেউ এটি করতে পারে না , এই কারণেই মহানবী (সা.)বলেছেন, আমি সেই খোদার পক্ষ থেকেই সতর্ক কারী এবং সুসংবাদদাতা হিসেবে এসেছি; যদি তোমরা আমার আনুগত্য করো এবং আমাকে কবুল করো, তবে তোমাদের জন্য বিরাট সব সুসংবাদ রয়েছে, কারণ আমি 'বাশির' (তথা সুসংবাদদাতা)। আর যদি প্রত্যাখ্যান করো, তবে মনে রেখো আমি 'নাযির' (তথা সতর্ককারী) হয়ে এসেছি; তখন তোমাদেরকে বড়ো বড়ো শাস্তি ও দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হতে হবে।"(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৭২-৪৭৩)

সুতরাং এটিই সেই বিষয় যা আমাদের গভীরভাবে দেখা উচিত। আমরা যখন মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ অনুসরণ করে তাঁকে মেনে নিয়েছি, তখন তাঁকে সুসংবাদদাতা হিসেবেই মেনে নিয়েছি। আর সেই সুসংবাদসমূহ আমরা তখনই অর্জন করতে পারব যখন আমরা আমাদের ইবাদতের হক আদায়কারী হবো এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণের জন্য সেই মান অর্জনের চেষ্টা করব। মনে রাখতে হবে, এই প্রচেষ্টার জন্য কুরবানী বা আত্মত্যাগ করতে হয়, জিহাদ (সংগ্রাম) করতে হয়। কিছু মানুষকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, 'আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার চেষ্টা করি'। এটি আত্মপ্রবঞ্চনা। যদি প্রকৃতই চেষ্টা করা হয়, তবে মনে এক উদ্‌বেগ থাকে। অতএব, আমাদের প্রত্যেকের আত্মপর্যালোচনা করা প্রয়োজন যে, আমাদের এই চেষ্টাগুলো প্রকৃত চেষ্টা কি না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, মহানবী (সা.)-এর ইবাদত কেমন ছিল? তিনি হেরা গুহায়চলে যেতেন, যেখানে বন্যজন্তু, সাপ এবং চিতা বাঘের ভয় ছিল। এর উল্লেখ আগেও করা হয়েছে যে, সেখানে গিয়ে তিনি দোয়া করতেন। এই বিষয়টি বর্ণনা করে তিনি (আ.) বলেন, এটি একটি সাধারণ নিয়ম যে, যখন একদিকের আকর্ষণ খুব বেড়ে যায়, তখন অন্যদিকের ভয় মন থেকে দূর হয়ে যায়। যখন আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার আকর্ষণ বেড়ে যায় এবং তাঁর ইবাদতের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, তখন অন্যান্য জাগতিক জিনিসের ভয় দূর হয়ে যায়। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন যে, অনেক মহিলা যাদের প্রকৃতি অত্যন্ত ভীরু হয়, দেখা গেছে যে, নিজ সন্তানের অসুস্থতার সময় অন্ধকার রাতে প্রয়োজনে তারা এমন জায়গায় চলে যায় যেখানে দিনের বেলা যাওয়াও তাদের জন্য কঠিন। তিনি (আ.) বলেন, যখন ঐশী ভয় এবং ভালোবাসা প্রবল হয়, তখন বাকি সব ভয় এবং ভালোবাসা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমন দোয়ার জন্য নির্জনতাও প্রয়োজন; এমনই পূর্ণ সম্পর্কের সাথেই নূর বা জ্যোতি প্রকাশিত হয়। আর প্রতিটি সম্পর্কে র জন্য একটি 'সতর' বা আবরণ প্রয়োজন হয়; অর্থাৎ সম্পর্ক যখন গোপন হয় তখনই তা (তথা নূর) প্রকাশিত হয়। (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৮৬)

তিনি (আ.) বলেন, ইবাদত শুধুমাত্র খোদা তা'লার জন্যই হওয়া উচিত, লোক-দেখানোর জন্য যেন না হয়। আনুগত্য, ইবাদত ও সেবার ক্ষেত্রে যদি ধৈর্য অবলম্বন করো, তাহলে খোদা কখনোই তা বৃথা যেতে দেবেন না। ইসলামে এমন হাজার হাজার মানুষ গত হয়েছেন যাদেরকে মানুষকেবল তাদের নূর দেখেই চিনে ফেলেছে। তাদের জন্য প্রতারকদের মতো গেরুয়া কাপড় বা লম্বা জোব্বা এবং বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্যসূচক পোশাকের প্রয়োজন নেই। আর খোদার সত্যবাদী বান্দারা এমন কোনো উর্দিতে সজ্জিতও হন নি যে, তারা জোব্বা পরে ভাববেন-তারা বড়ো ফকির, বড়ো সুফি বা বড়ো পুণ্যবান। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর এমন বিশেষ কোনো পোশাক ছিল না যা দিয়ে তিনি মানুষের মধ্যে স্বতন্ত্র হতে পারতেন; বরং একবার তো এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.)-কে মহানবী (সা.) মনে করে তাঁর সাথে করমর্দন করতে থাকেন এবং সম্মান প্রদর্শন শুরু করেন। অবশেষে হযরত আবু বকর (রা.) উঠে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে পাখা দিয়ে বাতাস করতে শুরু করেন এবং নিজের মুখের কথায় নয় বরং কাজের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন যে, মহানবী (সা.) হলেন ইনি! আমি তো কেবল একজন সেবক। যখন মানুষ খোদার ইবাদত করে, তখন তার রঙিন কাপড় পরা, একটি বিশেষ অবয়ব তৈরি করা এবং মালা ইত্যাদি ঝুলিয়ে চলার কী প্রয়োজন? [অর্থাৎ যারা গলায় তসবিহর মালা পরে এবং হাতে লম্বা লম্বা তসবিহ নিয়ে রাখে;] এমন লোক দুনিয়ার কুকুরসদৃশ। এরা তো দুনিয়াদার মানুষ, খোদাপ্রেমিক নয়। খোদার অন্বেষণকারীদের এতটুকু হুঁশ কোথায় যে, তারা পোশাক এবং উর্দির বিশেষ আয়োজন করবে? তারা তো লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে চান। ক্ষেত্রবিশেষে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ঐশী প্রজ্ঞার অধীনেকাউকে বাইরে টেনে আনেন যেন তাঁর উলুহিয়্যত বা ঈশ্বরত্বের প্রমাণ দিতে পারেন।

মহানবী (সা.)-এর মোটেও এই আকাঙ্ক্ষা ছিল না যে, মানুষ তাঁকে পয়গম্বর বলুক এবং তাঁর আনুগত্য করুক; আর একারণেই তিনি সেই হেরা গুহায়, যা

সফর বৃত্তান্ত (অস্ট্রেলিয়া, ২০১৩)

জলসা সালানা অস্ট্রেলিয়ায় সমাপ্তি ভাষণ

তাশাহহুদ, তা'আউয, তাসমিয়া এবং সূরা আল-ফাতিহা তিলাওয়াতের পর হুযূর আনওয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল 'আজীজ) বলেন:

এই মুহূর্তে আমি আমার বক্তব্য সেই আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু দিয়েই শুরু করব, যেগুলো আমাদের সামনে সদ্য তিলাওয়াত করা হয়েছে। এ সময় এগুলোর পূর্ণাঙ্গ তাফসির ও বিশদ আলোচনা করা হবে না; তথাপি সংক্ষেপে এর কয়েকটি মৌলিক দিক এখানে উপস্থাপন করছি।

হুযূর আনওয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল 'আজীজ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন তা হলো-একজন প্রকৃত মুমিন সর্বোচ্চ মানের আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। যখনই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তখন একজন প্রকৃত মুমিনের প্রতিক্রিয়া সর্বদাই একই হয়: "আমরা শুনেছি এবং আমরা আনুগত্য করেছি।" আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে যখন তোমাদের প্রতিক্রিয়া এমন হবে এবং তোমাদের উত্তর এ রূপ হবে, তখন বুঝে নিতে হবে যে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য অর্জন করেছ। আর সেই উদ্দেশ্য কী? সেটি হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

হুযূর আনওয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল 'আজীজ) আরও বলেন যে "আমরা শুনেছি এবং আমরা আনুগত্য করেছি-এই ঘোষণা ভয় বা মুনাফিকির কারণে হওয়া উচিত নয়; বরং এটি তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। এই আনুগত্য কেবল নিজের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে প্রদর্শিত হওয়া উচিত নয়। আবার এমনও হওয়া উচিত নয় যে কেবল সেই পরিস্থিতিতেই আনুগত্য প্রকাশ করা হবে, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের সুবিধা বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি ঘোষণা করেন যে আনুগত্যের প্রতিদানস্বরূপ তিনি তোমাদের মর্যাদা উন্নীত করবেন এবং তোমাদেরকে সফলতা দান করবেন।

তিনি আরও বলেন যে কেবল মুখের কথায় এ ধরনের দাবি করা উচিত নয়-যেমন, "আমাদের যদি কোনো নির্দেশ দেওয়া হয় তবে আমরা তা পালন করব," অথবা "আমরা এটি করব, আমরা সেটি করব।" অনুরূপভাবে এ ধরনের শূন্য ও অলঙ্কারমূলক ঘোষণা করা উচিত নয় যে আমরা জামা'আতের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। যখন ত্যাগের সময় উপস্থিত হয়, তখন যেন এমন না হয় যে মানুষ অজুহাত ও ব্যাখ্যা প্রদর্শন করতে শুরু করে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতিটি কর্ম সম্পর্কে অবগত; অতএব তোমাদের কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা কর। আল্লাহ তা'আলাকে প্রতারিত করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলা আরও ঘোষণা করেন যে আল্লাহ তা'আলা কিংবা তাঁর রসূল তোমাদের বক্তব্য বা উচ্চকণ্ঠ দাবির কোনো প্রয়োজন অনুভব করেন না। বরং যখন সময় উপস্থিত হয়, তখন তোমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে কোনো ত্যাগ থেকেই তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে না। অতঃপর তিনি বলেন যে এটি স্মরণ রাখা আবশ্যক যে রাসূলের দায়িত্ব হলো আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়া এবং তাদেরকে উপদেশ প্রদান করা। যদি মানুষ সেই নির্দেশাবলির উপর আমল না করে, তবে তার জন্য রসূল জবাবদিহি নন। যদি তোমরা কথা না শোনো কিংবা উপদেশ অনুযায়ী আমল না করো, তবে তার দায়ভার তোমাদের উপরই বর্তাবে, রসূলের উপর নয়।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে যদি তোমরা শ্রবণ করো এবং সে অনুযায়ী আমল করো, তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এর ফলে তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহসমূহের উত্তরাধিকারী হবে। আর সেই অনুগ্রহ কী? তিনি বলেন যে তোমরা একটি শৃঙ্খলে গাঁথা হয়ে যাবে; ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি হবে এবং তোমরা খিলাফতের বরকত থেকে উপকৃত হবে।

তিনি আরও বলেন যে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সেই দ্বীনের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যা তিনি তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা কোন দ্বীনকে পছন্দ করেছেন? পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে সেটি হলো ইসলাম। অতএব যারা খিলাফতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, তারাই প্রকৃত মুসলমান হবে; কারণ ইসলামের প্রকৃত আত্মা নিহিত রয়েছে ঐক্য ও একত্বের মধ্যে।

তিনি আরও বলেন যে যখন তোমরা একটি ঐক্যবদ্ধ সত্তায় পরিণত হবে, তখন তোমাদেরকে ক্ষমতা ও স্থিতিশীলতা প্রদান করা হবে। একটি জামা'আত হিসেবে তোমাদের শক্তি, সংহতি এবং ঐক্য একটি শক্তির প্রকাশ ঘটাবে এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তোমাদের সঙ্গী হবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে যদি ভয়ের পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়, তবে খিলাফতের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি তোমাদের জন্য সান্ত্বনা ও প্রশান্তির উপায় সৃষ্টি করতে থাকবেন এবং ভয়কে শান্তিতে রূপান্তরিত করবেন।

তিনি আরও বলেন যে তোমরা খিলাফতের এই নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ থাকো, যাতে তোমরা নিরন্তর আল্লাহ তা'আলার সমর্থন ও সাহায্যের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতে পারো। যারা এই নিয়ামত লাভ করবে তারা হলো প্রকৃত ইবাদতকারী-যারা নামাজের প্রতি মনোযোগী এবং ইবাদতের প্রতি নিবেদিত।

অতএব ইবাদতের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করার জন্য এবং এই অনুগ্রহসমূহের উপযুক্ত হওয়ার জন্য তোমাদের উচিত নামাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা-নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, সময়মতো আদায় করা, জামা'আতের সঙ্গে আদায় করা এবং অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় ধারণ করে তা সম্পাদন করা।

তিনি আরও বলেন যে ইবাদতের মানোন্নয়নের পাশাপাশি আর্থিক ত্যাগের প্রতিও মনোযোগ প্রদান করা আবশ্যক, যাতে ইসলামের প্রচার অব্যাহত থাকতে পারে এবং মানবাধিকারের দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করা যায়।

পরিশেষে তিনি বলেন যে এই বিষয়সমূহ এবং এই আর্থিক ত্যাগ তখনই ফলপ্রসূ হবে এবং তোমাদের উপকারে আসবে, যখন তোমরা রসূলের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে এবং পরবর্তীতে খিলাফতের ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য অবলম্বন করবে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমার নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য করা আমার আনুগত্য করা, আর আমার আনুগত্য করা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা।"

হুযূর আনওয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল 'আজীজ) বলেন যে যদি কেউ এই আয়াত এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণী গভীরভাবে পর্যালোচনা করে, তবে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে খিলাফতের আনুগত্য রসূলের আনুগত্যের ন্যায়ই অপরিহার্য। তদুপরি এটি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহসমূহ অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যদি এই আনুগত্যের মনোভাব বিদ্যমান থাকে, তবে বাহ্যিক পার্থিব দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সফলতা লাভ করা সম্ভব হবে। কিন্তু যদি আনুগত্য না থাকে এবং এমন কোনো খলিফা না থাকে যার আনুগত্য করা আবশ্যক, তবে সংখ্যা যতই অধিক হোক না কেন, প্রকৃত সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

বিশেষত যখন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রসঙ্গে বিষয় উত্থাপিত হয়, তখন কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রকৃত আনুগত্যই মানুষকে ঐশী অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী করে তোলে এবং তাকে খিলাফতের বরকত থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ প্রদান করে। অতএব সর্বদা এই বিষয়টি সামনে রাখা উচিত যে আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি সেই আয়াতে প্রদান করেছেন, যাকে আয়াতে ইস্তিখলাফ (খিলাফতের আয়াত) বলা হয়।

যদি বর্তমান পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয়, তবে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে আজ পৃথিবীর বুকে আহমদিয়া মুসলিম জামা'আত ব্যতীত অন্য কোনো সম্প্রদায় নেই, যারা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এই পথনির্দেশক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলি অনুসরণ করার চেষ্টা করছে এবং খিলাফতের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গভাবে সংযুক্ত রয়েছে।

বাস্তবিকপক্ষে এটিই আহমদিয়া মুসলিম জামা'আতের সত্যতার এবং খিলাফতের ব্যবস্থা যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সমর্থিত-তার এক অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণ। কারণ অন্যান্য মুসলিম গোষ্ঠীর তুলনায় আহমদিদের সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়া সত্ত্বেও আহমদিয়া মুসলিম জামা'আত ইসলামের মনোমুগ্ধকর শিক্ষা বিশ্বব্যাপী প্রচার করে চলেছে এবং এই প্রচারের ফলস্বরূপ তাদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হুযূর আনওয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল 'আজীজ) আরও বলেন যে আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে আমরা জিহাদ করি না। বাস্তবে, বর্তমান যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকৃত জিহাদ আহমদিয়া মুসলিম জামা'আতই সম্পাদন করছে। আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সৎকর্ম বলতে এমন কর্মকে বোঝায় যা সময়, পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই যুগে-যখন প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর আবির্ভাব সংঘটিত হয়েছে-তলোয়ারের জিহাদ সমাপ্ত হয়েছে, এবং বর্তমান সময়ে যে জিহাদ অপরিহার্য তা হলো কলমের জিহাদ।

এটি মিডিয়া, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং গবেষণাভিত্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিচালিত এক প্রকার জিহাদ, যা বিশ্বের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য অপরিহার্য।

হুযূর আনওয়ার (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) বলেছেন যে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতসমূহে বারবার আনুগত্যের উপর জোর দিয়েছেন। তারপর সমাপনী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে নামায আদায় এবং যাকাত প্রদানের পাশাপাশি রসূলের আনুগত্য করা আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত লাভের একটি মাধ্যম। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে আগত মসীহ ও মাহদীকে গ্রহণ করা উচিত, যাতে তোমাদের উপর রহমত নাযিল হয়। দীর্ঘ অন্ধকার যুগের পর প্রতিশ্রুত মসীহ ও প্রতীক্ষিত মাহদীর মাধ্যমে খিলাফতের ব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে, যিনি খাতামুল খুলাফা (খলিফাদের সীল)ও বটে।

হুযূর আনওয়ার (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) আরও বলেন যে এই খাতামুল খুলাফা আসার জন্যই নির্ধারিত ছিলেন, যাতে তিনি প্রকৃত আনুগত্য কী এবং প্রকৃত জিহাদ

কী, এবং তা কীভাবে সম্পাদন করতে হয়-তা প্রদর্শন করেন। সিঙ্গাপুর সফরের সময় অ-আহমদী ইন্দোনেশীয়দের একটি শিক্ষিত দলও উপস্থিত ছিল-তাদের মধ্যে অধ্যাপক, ডাক্তার এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। তারা অভিযোগ তোলে যে জামাত জিহাদে বিশ্বাস করে না। আমি উত্তরে বলেছিলাম যে আমরা অবশ্যই জিহাদে বিশ্বাস করি; আমরা এর বিরোধী নই। তবে বর্তমান যুগে যে ধরনের জিহাদ প্রয়োজন তার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। এই সময়ে কোনো সরকার বা সংগঠন ইসলামকে একটি ধর্ম হিসেবে আক্রমণ করছে না। যে সংঘর্ষগুলো রয়েছে সেগুলো রাজনৈতিক প্রকৃতির; ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মের নামে আক্রমণ করা হচ্ছে না। আজ যদি ইসলামের উপর আক্রমণ হয়, তা তরবারির মাধ্যমে নয় বরং সংবাদপত্রের মাধ্যমে, গণমাধ্যমের মাধ্যমে এবং প্রচারণার মাধ্যমে। অতএব আজ আমাদেরও জবাব দেওয়ার জন্য সেই একই উপায় ব্যবহার করতে হবে। এটিই প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন-এই যুগে কলম সেই কাজ করবে যা এক সময় তরবারি করত। সুতরাং বর্তমান যুগে এটিই জিহাদের অস্ত্র, যার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ ইসলাম অগ্রসর হবে।

হুযূর আনওয়ার (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) বলেন যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্যের ফলেই জামাত দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। আন্তরিক ও সৎ মুসলমানরাও সত্যকে আবিষ্কার করছে এবং সেই প্রকৃত ইসলামের সাথে যুক্ত হচ্ছে, যা প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) উপস্থাপন করেছিলেন-যার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছিলেন এবং যার শিক্ষা তিনি নিজেই কর্মযোগে বাস্তবায়িত করেছিলেন। এই একই শিক্ষা পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান। অন্য মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও তারা না তবলিগের কাজে নিয়োজিত, না ইসলামের কোনো উল্লেখযোগ্য সেবা করছে। তারা কেবল "জিহাদ-এর স্লোগান দেয়। অথচ জিহাদ মানে হত্যা ও রক্তপাত নয়। জিহাদ মানে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়া এবং এর সুন্দর শিক্ষা বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ করা। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান নীরব থাকে। তারা বলে জিহাদ হওয়া উচিত, কিন্তু নিজেরা তা পালন করে না। অন্যদিকে আরেকটি দল জিহাদের নামে অবিচার করে এবং বিশ্বে শান্তি ধ্বংস করে, ফলে ইসলামের সুনাম হানি হয়। বিশ্বের দৃষ্টিতে এ ধরনের মানুষের মর্যাদা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে, কারণ তাদের কাজ না কোনো সফলতা আনে, না সম্মান। বিপরীতে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের মর্যাদা বিশ্বে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এটি জামাতের নিজস্ব মর্যাদা বৃদ্ধি নয়; বরং ইসলামের বার্তাই বিশ্বে পৌঁছাচ্ছে এবং ইসলামের শিক্ষা ক্রমশ আরও উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

হুযূর আনওয়ার (আই.) আরও বলেন যে আহমদিয়া মুসলিম জামাত বহু ভাষায় পবিত্র কুরআন প্রকাশ করছে। ইসলামের প্রতিরক্ষায় সাহিত্য রচনা করা হচ্ছে এবং বিরোধীদের আপত্তির জবাব দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং আজ এই কাজগুলো আহমদিয়া মুসলিম জামাতই করছে। আমাদের তবলিগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো এমটিএ , যা বিভিন্ন ভাষায় দিনরাত ইসলামের প্রকৃত বার্তা এবং আহমদিয়াত প্রচার করছে। এর দ্বারা বিশ্ব প্রভাবিত হচ্ছে। এমনকি মুসলমানরাও এমটিএর মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারছে। যদিও অন্য মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তবুও ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির জবাব দিতে না পারার কারণে তারা বিব্রত বোধ করে। কিন্তু যখন থেকে এমটিএ দেখার সুযোগ পাওয়া লোকেরা লিখতে শুরু করেছে যে এখন তারা মাথা উঁচু করে চলতে পারছে, তখন পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে। আমি এর কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করব। কিছু মানুষ এখনও আহমদিয়াত গ্রহণ করেনি, তবুও তারা প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে; আবার কেউ কেউ এসব অনুষ্ঠান শুনে আহমদিয়াত গ্রহণ করেছে।

হুযূর আনওয়ার (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) বলেন যে আলজেরিয়ার এক বন্ধু আবদুল করীম সাহেব বর্ণনা করেন যে ২০০৭ সালে একদিন তিনি হঠাৎ করে এমটিএ দেখতে শুরু করেন। একটি অনুষ্ঠানে তিনজন যুবক আলোচনা করছিলেন এবং বলছিলেন যে ইমাম মাহদী আবির্ভূত হয়েছেন। এই আলোচনা তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। হানি সাহেব মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সম্পৃক্ত কিছু ভুল বর্ণনার খণ্ডন করছিলেন, যেগুলো তাকে দীর্ঘদিন ধরে উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল। প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে তার মনে অনেক প্রশ্ন ছিল। তিনি পুরো অনুষ্ঠানটি দেখলেন এবং ধীরে ধীরে তার সন্দেহ দূর হতে লাগল এবং তার বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে লাগল। পরে যখন তিনি মুস্তফা সাবিত সাহেবের আল-সিরাতুল মুতাহ্হারাহ গ্রন্থে নবীদের অঙ্গীকার সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যা পড়লেন, তখন তা তাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এরপর তিনি এমটিএর অনুষ্ঠান রেকর্ড করতে শুরু করেন এবং সেগুলো বারবার শুনতে থাকেন। যখন তিনি তার পরিবারকে বিষয়টি জানালেন, তারাও সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করে, যদিও তখনও তাদের পূর্ণ দৃঢ়তা অর্জিত হয়নি। সময়ের সাথে সাথে তার মনে কিছু প্রশ্ন রয়ে যায় এবং তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে সেই প্রশ্নগুলোর সমাধান হলে তিনি বায়'আত গ্রহণ করবেন। তবে এখন তিনি মনে করেন যে অপেক্ষা করা তার ভুল ছিল; তার তখনই বায়'আত করা উচিত ছিল।

ইয়েমেনের আলী সাহেব লিখেছেন যে এমটিএর মাধ্যমে যারা সেবা করছেন তাদের প্রতি যত কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করা হোক না কেন, তা যথেষ্ট হবে না। তিনি সব কর্মীদের জন্য অবিরত দোয়া করেন যাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের সেবার জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান দান করেন। তিনি বলেন যে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের যেসব বই তিনি এখন পর্যন্ত পড়েছেন, সেগুলোর মধ্যে তিনি সেই সত্য ইসলাম খুঁজে পেয়েছেন যা তিনি দীর্ঘদিন ধরে অনুসন্ধান করছিলেন।

হুযূর আনওয়ার (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) বলেন যে যদি কেউ এমটিএর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখে তবে প্রতিটি আহমদীর জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের শিশু ও তরুণদের জ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে। এজন্য তিনি বারবার জোর দিয়ে বলেন যে যেহেতু আমরা এমটিএর জন্য এত ব্যয় করি, তাই প্রতিটি আহমদীর উচিত প্রতিদিন অন্তত একটি অনুষ্ঠান শোনার জন্য কিছু সময় নির্ধারণ করা।

আরব দেশের আহমদ সাহেব বলেন যে এই প্রথম তিনি হুযূরকে সরাসরি লিখছেন। তিনি প্রথমে বলতে চান যে হুযূরের কুরআনের তাফসীরসমূহ শ্রেষ্ঠ তাফসীরগুলোর মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো এই সুসংবাদ যে সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ আরবি ভাষাভাষী মানুষ এই চ্যানেল দেখে ও শোনে। তিনি বলেন যে এ বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কারণ তিনি অসংখ্য মানুষের কাছ থেকে এটি শুনেছেন এবং নিজ চোখে দেখেছেন।

আলজেরিয়ার আরেক বন্ধু কামাল সাহেব বলেন যে তিনি একজন আমাজিগ আলজেরীয় যুবক। কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত তিনি প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতেন না। পরে কিছু আলেমের সিডি এবং একটি ইসলামিক টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে তিনি কিছুটা প্রভাবিত হন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই সেই প্রভাব চলে যায়, কারণ তিনি উপলব্ধি করেন যে তাদের বক্তব্য পরস্পরবিরোধী এবং যুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পরে হিওয়ার আল-মুবাশির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সাথে পরিচিত হন। ধীরে ধীরে তিনি এমটিএ দেখতে শুরু করেন। একদিন তিনি দেখেন যে এক সালাফি আলেম জামাতের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলছেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না কেন এ ধরনের আলেমরা জামাতের বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করার পরিবর্তে গালিগালাজ করে। তাই তিনি আরও মনোযোগ দিয়ে এমটিএ দেখা শুরু করেন, এবং অবশেষে আল্লাহ তা'আলার কৃপায় তিনি বায়'আত গ্রহণ করেন। পরে ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকার পাওয়ার পর তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর রচনাবলি অধ্যয়ন করেন, নিজের ত্রুটিগুলো সংশোধন করেন এবং বায়'আতের শর্তসমূহ পুরোপুরি মেনে চলার সংকল্প করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) আধ্যাত্মিক চেতনা সৃষ্টি করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তিনি নিজের অবস্থাকে এমন একজন মানুষের সাথে তুলনা করেন, যে ঘুম থেকে জেগে উঠে হঠাৎ সূর্যের আলো দেখতে পায়। এখন তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হলো বায়'আতের শর্তসমূহ পুরোপুরি মেনে চলা। (এ সম্পর্কে হুযূর মন্তব্য করেন যে এটি নতুনভাবে জামাতে প্রবেশকারীদের মানদণ্ড।)

আরব দেশের আরেক বন্ধু আবদুল্লাহ সাহেব লিখেছেন যে প্রায় দুই বছর আগে তিনি টেলিভিশনের চ্যানেল পরিবর্তন করতে করতে এমটিএ আল-আরাবিয়্যাহ দেখতে পান। শুরুতে তিনি এটিকে তেমন গুরুত্ব দেননি, কিন্তু ধীরে ধীরে আল-হিওয়ার আল-মুবাশির এবং লিকাআ মা'আল-আরব এর মতো অনুষ্ঠান শুনতে শুরু করেন, যেখানে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদীর আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হতো। তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াতের এমন গভীর ব্যাখ্যা শুনেছিলেন যা সরাসরি তার হৃদয়ে প্রভাব ফেলেছিল। কুরআনের তাফসীর এবং হাদিসের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে তার জ্ঞান দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি অনুভব করেন যেন তিনি নতুন জীবন লাভ করেছেন। তিনি নামায ও দোয়ার প্রকৃত উপলব্ধি অর্জন করেন এবং তার হৃদয় সাক্ষ্য দেয় যে হযরত মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী (আলাইহিস সালাম) সত্যিই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী। এরপর তিনি কুরআন ও হাদিসের আলোকে তার বন্ধু ও পরিচিতদের মধ্যে প্রচার শুরু করেন, যদিও তারা উত্তরে নানা কল্পকাহিনি ও ভিত্তিহীন গল্প উপস্থাপন করত। তিনি বলেন যে এমটিএ থেকে তিনি অনেক কিছু শিখেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই শিক্ষাগুলোই সেই ধনভাণ্ডার যা প্রতিশ্রুত মসীহ বিতরণ করার জন্য এসেছিলেন। সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে শোনে, বুঝে এবং গ্রহণ করে। তিনি বলেন যে এখন তিনি বাড়িতে নামায আদায় করেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। (অর্থাৎ তিনি আর সেখানে আলেমদের পেছনে জামাতে নামায পড়তে চান না, কারণ তিনি এটিকে ভণ্ডামি মনে করেন, যেহেতু তিনি এখন একজন আহমদী হয়ে গেছেন।)

একইভাবে মরক্কোর এক বন্ধু আনাস সাহেব বলেন যে ২০১০ সালে এমটিএ আল-আরাবিয়্যার মাধ্যমে তার প্রথম জামাতের সাথে পরিচয় ঘটে। তিনি বিশেষ করে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে এমটিএতে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলোকে খুবই প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা রয়েছে। এমটিএতে প্রতিশ্রুত মসীহের ছবি দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন, কারণ আঠারো বছর আগে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে তিনি দেখেন একজন ব্যক্তি তার ডান হাতে একটি তরবারি এবং বাম হাতে একটি বর্শা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি নিজে সেই ব্যক্তির দিকে এগিয়ে যান এবং দ্রুত তার ডান হাত থেকে তরবারিটি নিয়ে নেন, তখন সেই ব্যক্তি তার দিকে হাসলেন। ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর সেই স্বপ্ন তার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি ভেবেছিলেন যে সেই ব্যক্তিটি হয়তো মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি এমটিএতে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর ছবি দেখেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে আঠারো বছর আগে স্বপ্নে তিনি ঠিক সেই একই মুখ দেখেছিলেন। (চলবে...)

সীরাত খাতামান্নবীঈন

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ

জাতীয় রীতি ও বৈশিষ্ট্য

আরবদের নিন্দনীয় স্বভাবগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে তিনটি অভ্যাস খুবই প্রচলিত ছিল–মদ্যপান, জুয়া এবং ব্যভিচার। এ ধরনের কাজ এতটাই ব্যাপক ছিল যে মানুষ কেবল আল্লাহর নিকট আশ্রয়ই প্রার্থনা করতে পারে। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এগুলোকে সাধারণত গৌরবের বিষয় হিসেবেই গণ্য করা হতো। জাহেলি যুগের কবিরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এসব দোষসংক্রান্ত নিজেদের কীর্তির বর্ণনা দিতেন। প্রকৃতপক্ষে, এমন উল্লেখ ছাড়া আরবদের কাছে কোনো কবিতাই প্রায় পূর্ণ বলে বিবেচিত হতো না। কাসিদার শুরুতে–তার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন–কবিকে তার প্রকৃত বা কল্পিত প্রেয়সীর কথা স্পষ্টভাবে বলতে হবে এবং তার আনন্দঘন আসরের কিছু ঘটনার বর্ণনাও দিতে হবে–এটাই যেন একটি প্রচলিত নিয়ম ছিল।

কাআব ইবনে জুহাইর ছিলেন একজন সুপরিচিত কবি। তিনি একবার মহানবী (সা.)–এর উপস্থিতিতে এসে তাঁর প্রশংসায় একটি কাসিদা পাঠ করেন, যা আজ "বানাত সু?আদ"নামে প্রসিদ্ধ। এর প্রারম্ভিক পংক্তিতেই কবি তাঁর প্রেয়সীর বিচ্ছেদের বিলাপ করেছেন। সমাজে নির্লজ্জতার মাত্রা এমন ছিল যে কখনও কখনও মালিকেরা নিজেদের দাসীদের অনৈতিক কাজে বাধ্য করত এবং সেই কাজ থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিজেদের জন্য সংগ্রহ করত। এটিকেও আয়ের একটি উৎস বলে মনে করা হতো। তবে উচ্চ বংশের মানুষরা সাধারণত এমন চরম নির্লজ্জতা থেকে নিজেদের বিরত রাখতেন।

অজ্ঞতা ও অযৌক্তিক উগ্রতাও আরবদের মধ্যে এতটাই প্রবল ছিল যে তুচ্ছ বিষয়েও প্রায়ই তরবারি বের হয়ে যেত। ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায়, কখনও কখনও একেবারেই সামান্য ঘটনা দুই গোত্রের মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা করত। ধীরে ধীরে অন্যান্য গোত্রও এতে জড়িয়ে পড়ত এবং হত্যা ও লুটপাটের চক্র বহু বছর ধরে চলতে থাকত। নিম্নে যে ঘটনাটি উল্লেখ করা হলো, তা সেই সময়কার আরব ইতিহাসের কেবল একটি ছোট অধ্যায়।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে কুলাইব ইবনে রবীআহ নামে এক শক্তিশালী ও প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তিনি উত্তর–পূর্ব আরবে বসবাসকারী বনু তাগলিব ইবনে ওয়াইল গোত্রের প্রধান ছিলেন। কুলাইবের স্ত্রী জালিলা বিনতে মুররাহ বনু বকর ইবনে ওয়াইল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জালিলার এক ভাই ছিল–জাসসাস–যিনি তাঁর খালা বাসুসের সঙ্গে বসবাস করতেন। একদিন সা?দ নামে এক ব্যক্তি বাসুসের কাছে অতিথি হয়ে আসেন। সা?দের একটি উটনী ছিল, যার নাম ছিল সারাব। আত্মীয়তার কারণে এটি জাসসাসের উটগুলোর সঙ্গে কুলাইবের চারণভূমিতে চরত।

একদিন কুলাইব একটি গাছের নিচ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি উপরে একটি পাখির ডাক শুনে তাকিয়ে দেখলেন, গাছে পাখিটি বাসা বেঁধেছে এবং তাতে ডিম দিয়েছে। কুলাইব প্রধানের মতো কর্তৃত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে পাখিটিকে দেখে বললেন, "ভয় করো না, আমি তোমাকে রক্ষা করব।" পরদিন যখন তিনি আবার সেই জায়গা দিয়ে গেলেন, দেখলেন ডিমগুলো গাছ থেকে পড়ে গেছে এবং কোনো পশুর পায়ের নিচে চূর্ণ হয়ে আছে, আর পাখিটি উপরে বসে করুণভাবে কাঁদছে। আগের দিনের কথা মনে করে কুলাইব প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লেন। চারপাশে তাকিয়ে তিনি দেখলেন সাআদের উটনী কাছেই চরছে। তিনি ধারণা করলেন, এ উটনীই ডিমগুলো নষ্ট করেছে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তিনি তাঁর শ্যালক জাসসাসের কাছে গিয়ে বললেন, "দেখো জাসসাস! এখনই আমার মনে একটি চিন্তা এসেছে। যদি আমি নিশ্চিত হতাম, তবে ব্যবস্থা নিতাম। তবে খেয়াল রেখো, সাআদের উটনী যেন আর এই পশুর পাল নিয়ে এখানে না চরতে আসে।"

আরব মরুভূমির রক্ত জাসসাসের শিরায়ও প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি জবাব দিলেন, "এটি আমাদের অতিথির উটনী। যেখানে আমার উট চরবে, এটিও সেখানে চরবে।" কুলাইব বললেন, "ঠিক আছে। আমি যদি আবার এই উটনীকে এখানে দেখি, তবে এর থনিতে তীর মেরে হত্যা করব।" জাসসাস বললেন, "যদি তুমি তা করো, তবে ওয়াইলের মূর্তির শপথ করে বলছি–আমি তোমার বুকে তীর বিদ্ধ করব।" এ কথা বলে জাসসাস চলে গেলেন। আর কুলাইব ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বাড়ি ফিরে স্ত্রী জালিলাকে বললেন, "আমার বিরুদ্ধে প্রতিবেশীকে রক্ষা করার সাহস কার আছে বলে তুমি মনে কর?"তিনি বললেন, "এমন কেউ নেই–হয়তো আমার ভাই জাসসাস ছাড়া; সে যদি মুখে কিছু বলে থাকে, তবে নিশ্চয়ই তা পূরণ করবে।"

এরপর জালিলা বহু চেষ্টা করেও এই বিরোধ থামাতে পারলেন না। অবশেষে একদিন যখন কুলাইব তাঁর উটগুলোকে পানি পান করাচ্ছিলেন, তখন জাসসাসও তাঁর উট নিয়ে সেখানে এলেন। কাকতালীয়ভাবে সাআদের উটনী জাসসাসের পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কুলাইবের উটের মধ্যে এসে পানি পান করতে লাগল। কুলাইব মনে করলেন জাসসাস ইচ্ছা করেই এটিকে ছেড়ে দিয়েছে। তিনি ধনুক তুলে উটনীর থনিতে তীর ছুড়লেন, যা সঠিকভাবে আঘাত করল। উটনীটি যন্ত্রণায় ছুটে বেড়াতে লাগল এবং শেষে জাসসাসের খালা বাসুসের ঘরের সামনে গিয়ে পড়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে বাসুস মাথা চাপড়াতে লাগলেন এবং চিৎকার করে বললেন, "লজ্জা! লজ্জা! আমাদের অপমান করা হয়েছে–আমাদের অতিথির উটনীকে হত্যা করা হয়েছে!

জাসসাস এই কথা শুনে অপমান ও ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন এবং উত্তেজনার বশে কুলাইবকে হত্যা করলেন। কুলাইবের হত্যাকাণ্ড তাগলিব গোত্রের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিল। ফলে তাগলিব ও বকর গোত্রের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হলো। এত রক্তপাত ঘটল যে মানুষ কেবল আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে। অবশেষে চল্লিশ বছর পর–যখন উভয় গোত্র দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল–হিরাহ রাষ্ট্রের রাজা মুনযির তৃতীয়ের মধ্যস্থতায় সমঝোতা স্থাপিত হয়। আরব ইতিহাসে এই যুদ্ধ বাসুসের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

আরবদের যুদ্ধে সার অর্থাৎ প্রতিশোধের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রতিশোধ যেন তাদের ধর্ম ও সামাজিক চেতনার অন্যতম মৌলিক উপাদান ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির আত্মা একটি প্রাণীর রূপ ধারণ করে আকাশে ঘুরে বেড়ায় এবং বিলাপ করে–এ প্রাণীকে তারা সুদা বলত। কোনো গোত্রের সদস্য নিহত হলে তার আত্মীয় ও গোত্রের লোকদের দায়িত্ব ছিল হত্যাকারীকে বা তার কোনো আত্মীয়কে অথবা অন্তত তার গোত্রের কাউকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেওয়া।

প্রতিশোধের পরিবর্তে দিয়াহ (রক্তমূল্য) গ্রহণের প্রথাও ছিল। কিন্তু এখানে অর্থের চেয়ে বড় বিষয় ছিল হত্যাকারীর গোত্রকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে তাদের অপমান করা। সাধারণত নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ নেওয়া না পর্যন্ত তার আত্মীয়দের হৃদয়ে জ্বলন্ত যন্ত্রণা প্রশমিত হতো না। কিন্তু এক পক্ষের প্রতিশোধের আগুন নিভলে অন্য পক্ষের মধ্যে তা জ্বলে উঠত, ফলে প্রতিহিংসার এই চক্র এমনভাবে বিস্তৃত হতো যে কখনও কখনও সম্পূর্ণ গোত্র ধ্বংস হয়ে যেত।

প্রতিশোধ শুধু হত্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না। অনেক সময় মৃতদেহের হাত, পা, কান বা নাক কেটে ফেলা হতো, যাতে ক্রোধ প্রশমিত হয়। আরবদের মধ্যে এই প্রথাকে মুসলাহ বলা হতো এবং যুদ্ধক্ষেত্রে এটি প্রচলিত ছিল। পরে দেখা যাবে, উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ–যার পিতা উতবা বদরের যুদ্ধে হযরত হামযার হাতে নিহত হয়েছিল–তিনি হযরত হামযার দেহের সঙ্গে এমন আচরণই করেছিলেন; এমনকি নির্মমভাবে তাঁর যকৃত ছিঁড়ে চিবিয়েছিলেন।

যুদ্ধের সময় আরবরা কখনও কখনও বন্দি নারী ও শিশুদেরও হত্যা করত। শত্রুর মাথার খুলি দিয়ে মদ পান করা, গর্ভবতী নারীদের বর্শাঘাতে গর্ভপাত ঘটানো এবং ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করে হত্যা করা–এসব কাজ আরব সমাজে সাধারণত অবৈধ বলে গণ্য করা হতো না।

যুদ্ধের সময় তারা উঁচু স্থানে আগুন জ্বালিয়ে রাখত এবং পুরো যুদ্ধকাল তা জ্বলতে থাকত। আগুন নিভে যাওয়া অশুভ লক্ষণ বলে মনে করা হতো। পরে দেখা যাবে, খন্দকের যুদ্ধে এক সেনাপতির আগুন দুর্ঘটনাবশত নিভে গেলে তিনি আতঙ্কে রাতে একাই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন, ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভ্রান্তি ও পশ্চাদপসরণ ঘটে।

যুদ্ধে নারীরাও প্রায়ই যোদ্ধাদের সঙ্গে যেতেন। তারা সম্মান ও বীরত্ব জাগ্রতকারী কবিতা আবৃত্তি করতেন, যা আরবদের যুদ্ধোৎসাহ আরও বাড়িয়ে দিত। আহতদের সেবাও তারা করতেন। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগেও এই প্রথা কিছুটা অব্যাহত ছিল।

যুদ্ধে প্রথমে সাধারণত একক যোদ্ধাদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হতো, তারপর সাধারণ আক্রমণ শুরু হতো। আরবরা সাধারণত তিন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করত–ধনুক–তীর, বর্শা এবং তরবারি। সুরক্ষার জন্য তারা বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করত। তারা ঘোড়ায় এবং পদাতিক উভয়ভাবেই যুদ্ধ করত। তবে বীর যোদ্ধাদের কাছে যুদ্ধের সময় ঘোড়া থেকে নেমে নিজের ঘোড়ার পায়ের শিরা কেটে দেওয়া–যাতে পালানোর পথ না থাকে–বীরত্বের নিদর্শন বলে মনে করা হতো। সামরিক অভিযানে বোঝা বহনের জন্য উট ব্যবহৃত হতো।

আরবদের কাছে সাহস ও বীরত্ব অত্যন্ত মহৎ গুণ বলে বিবেচিত হতো। আরব কবিরা নিজেদের এবং নিজেদের গোত্রের বীরত্বগাথা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কবিতায় বর্ণনা করতেন। প্রকৃতপক্ষে, বীরত্ব ছিল তাদের জাতীয় চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মৃত্যুভয়কে অত্যন্ত লজ্জাজনক বলে মনে করা হতো; যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় পেত, সমাজে তাকে তুচ্ছজ্ঞান করা হতো। বাস্তবে বীরত্ব আরব জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল।

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Waseya Begum, Harhari (Murshidabad)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

আরবদের গৌরব ও সম্মানবোধ সম্পর্কেও বহু কাহিনি প্রসিদ্ধ। আমর ইবনে কুলসুমের বিখ্যাত রচনা 'মুআল্লাকা' আরব গর্বের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ, যেখানে তিনি আমর ইবনে হিন্দকে আরবদের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সম্বোধন করেছেন। সাধারণভাবে আরবরা চুক্তি বা অঙ্গীকারকে ততটা গুরুত্ব দিত না যখন তা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেত। তবে তাদের আনুগত্যের কিছু দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিস্ময়কর। সামুয়েল ইবনে আদিয়া ইমরুল কায়েসের আমানত রক্ষার জন্য নিজের তরুণ পুত্রকে উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করেননি।

উদারতা আরবদের কাছে একটি অত্যন্ত মহৎ গুণ ছিল। প্রতিবেশী ও অতিথিকে রক্ষা করা তাদের নৈতিক বিধানের অংশ ছিল। আতিথেয়তা যেন তাদের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল। রাতে তারা উঁচু স্থানে আগুন জ্বালাতেন যাতে বিপদগ্রস্ত পথিক তা দেখে আশ্রয় পেতে পারে। অতিথির জন্য ঘরে যা কিছু আছে সব ব্যয় করতে তারা দ্বিধা করতেন না। এই প্রসঙ্গে আরব বীর হাতিম তাইয়ের উদারতা ও আতিথেয়তার কাহিনিগুলো সুপরিচিত।

নিজের গোত্রের প্রতি আনুগত্য আরবদের কাছে একেবারে অপরিহার্য কর্তব্য ছিল। এক কবি গর্বের সঙ্গে বলেছেন:

"আমি গাজিয়্যা গোত্রের মানুষ; তারা যদি পথভ্রষ্ট হয়, আমিও পথভ্রষ্ট হব, আর তারা যদি সঠিক পথে চলে, আমিও সেই পথেই চলব।"

বংশগৌরবের অহংকারও আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তারা গর্বের সঙ্গে নিজেদের পূর্বপুরুষদের কীর্তিগাথা বর্ণনা করত। এই অহংকারের কারণেই তারা দাস ও চাকরদের প্রতি গভীর অবজ্ঞা প্রদর্শন করত।

শত্রুর সঙ্গে আচরণে আরবরা সাধারণত কঠোর ও আপসহীন ছিল। আগে উল্লেখিত রক্তাক্ত প্রতিশোধনীতি তাদের চরিত্রের কেন্দ্রীয় অংশ ছিল। প্রতিশোধের তুলনায় কখনও কখনও আল্লাহর ফয়সালাকেও তারা ততটা গুরুত্ব দিত না। এক কবি বলেছেন:

"আমি অবশ্যই তরবারি দিয়ে আমার অপমান ধুয়ে ফেলব; এর ফলে আল্লাহর ফয়সালায় যা-ই আসুক না কেন।"

আরবরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিল, এবং তাদের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। প্রাচীনকাল থেকেই তারা নিজেদের জাতীয় ও পারিবারিক ঐতিহ্য মুখস্থ রাখত এবং বিভিন্ন উপলক্ষে তা আবৃত্তি করত। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে দুই যোদ্ধা দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসত, তখন প্রথমে তারা একে অপরের বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করত। যদি কারও বংশ নিম্ন বলে বিবেচিত হতো, তবে তাকে উচ্চ বংশের প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেওয়া হতো না।

আরবরা বছর ও মাস গণনা করত চন্দ্রচক্র অনুযায়ী। বারো মাসের মধ্যে প্রথম, সপ্তম এবং শেষের দুই মাসকে পবিত্র মাস হিসেবে গণ্য করা হতো, যার মধ্যে যুদ্ধ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। তবে কখনও কখনও নিজেদের সুবিধার জন্য তারা এই মাসগুলোকে সামনে বা পেছনে সরিয়ে দিত, যাতে প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে পারে এবং পাপের ভয়ে না থাকতে হয়। এই প্রথাকে নাসি বলা হতো।

(সীরাত খাতামুন্ নবিয়্যীন, পৃ. ৫৫-৫৯, কাদিয়ান, ২০০৬) (চলবে)

আপনি কি প্রত্যহ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করেন?

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ

অনুবাদ: পবিত্র আল্লাহ্, তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র; পবিত্র আল্লাহ্, যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ্, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অনুবাদ: আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি আমার পালনকর্তা, এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অনুবাদ: হে আমার প্রভু, সমস্ত কিছুই তোমার দাস; অতএব হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা কর এবং আমাকে সাহায্য কর।

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum**

কাদিয়ানের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুস সানাত-এ ২০২৬-২৭ এর জন্য ভর্তি চলছে।

দারুস্-সানাআত কাদিয়ান ২০১০ সালে হযরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয)-এর অনুমোদন ও বিশেষ দিকনির্দেশনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আহমদী শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে তোলা এবং টেকনিক্যাল কোর্সের মাধ্যমে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

দারুস্-সানাআত কাদিয়ান ভারতের সরকারি প্রতিষ্ঠান NSIC (দিল্লি)-এর সাথে নিবন্ধিত এবং ISO-তেও নিবন্ধিত। এখানে এক বছরের নিম্নলিখিত কোর্সসমূহ পরিচালিত হয়-

1.Computer applications 2.Plumbing 3.Electrician 4.Motor vehicle mechanic 5.Diesel mechanic 6.welding 7.Ac & refrigerator

কাদিয়ানের বাইরে থেকে আগত আহমদী শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল ও মেসের ব্যবস্থা রয়েছে। থাকা ও খাবারের কোনো ফি নেই। কেবল কোর্সের বোর্ড ফি সহজ কিস্তিতে নেওয়া হয়।

যেসব আহমদী তরুণ তাদের স্কুল শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেনি, অথবা অষ্টম বা দশম শ্রেণির পর টেকনিক্যাল কোর্স করতে আগ্রহী, তারা ভর্তির জন্য দ্রুত যোগাযোগ করুন। আহমদী শিক্ষার্থীদের দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থাও এখানে রয়েছে।

নতুন সেশন ২০২৬-২০২৭-এর জন্য ভর্তি শুরু হয়েছে।

ক্লাস শুরু হবে ১ আগস্ট ২০২৬ থেকে।

আরও তথ্যের জন্য নিচের নম্বর বা ইমেইলে যোগাযোগ করতে পারেন-

ইমেইল: darulsanaat.qadian@gmail.com

ফোন: 9872725895 / 8604024043

(প্রিন্সিপাল, দারুস্-সানাআত কাদিয়ান)

ড্রাইভার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

সদর আঞ্জুমান আহমদিয়া, কাদিয়ান

শর্তাবলি

১) প্রার্থীর বয়স ১৮ বছরের বেশি এবং ৪০ বছরের কম হতে হবে।

২) প্রার্থীকে কমপক্ষে দশম শ্রেণি পাস হতে হবে।

৩) প্রার্থীর কাছে ফোর-হুইলার (চার চাকার গাড়ি) চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকা আবশ্যক।

৪) প্রার্থীর কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ২ বছরের ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সেই প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতার সনদ (Experience Certificate) আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

৫) প্রার্থীর জন্ম সনদ (Birth Certificate) জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

৬) প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারে (ইন্টারভিউ) উত্তীর্ণ হতে হবে।

৭) লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ড্রাইভিং টেস্ট নেওয়া হবে।

৮) প্রার্থীকে নূর হাসপাতাল, কাদিয়ান থেকে প্রাপ্ত মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট অনুযায়ী সুস্থ ও কর্মক্ষম হতে হবে।

৯) নিয়োগের পর ড্রাইভারকে দ্বিতীয় গ্রেড অনুযায়ী ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হবে।

১০) নির্বাচিত হলে প্রার্থীকে প্রথম পাঁচ বছর কাদিয়ানে নিজের বাসস্থানের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

১১) প্রার্থীর কাদিয়ানে যাতায়াতের সমস্ত ভ্রমণ ব্যয় নিজেকেই বহন করতে হবে।

নোট: লিখিত পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার ও ড্রাইভিং টেস্টের তারিখ পরবর্তীতে প্রার্থীদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

নযারত দিওয়ান, সদর আঞ্জুমান আহমদিয়া, কাদিয়ান

পিন কোড: 143516

মোবাইল: 09888232530, 09682627592

অফিস: 01872-501130

ই-মেইল: diwan@qadian.in

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 19 Mar 2026 Issue No.12

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সীরাতুল মাহদী

–হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

(এই বর্ণনায় যেখানে হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)–এর মা মাথা ঘোরা সম্পর্কে হিস্টেরিয়া শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সেখানে তা চিকিৎসা–বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে হিস্টেরিয়া বলা হয় সেই রোগকে বোঝায় না। বরং মাথা ঘোরার আক্রমণ ও হিস্টেরিয়ার মধ্যে আংশিক সাদৃশ্য থাকার কারণে এখানে শব্দটি একটি অ–চিকিৎসাগত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যথায়, যেমন দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৬৫ ও ৩৬৯ নম্বর বর্ণনায় ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বাস্তবে হযরত মসীহে মাওউদ হিস্টেরিয়া রোগে আক্রান্ত ছিলেন না।

প্রকৃতপক্ষে, হযরত মসীহে মাওউদ নিজে তাঁর লেখায় যখনই এই অসুস্থতার উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি কখনোই এর জন্য হিস্টেরিয়া বা এ ধরনের কোনো শব্দ ব্যবহার করেননি। চিকিৎসা–বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মাথা ঘোরা বা চক্কর লাগার রোগকে কোনো অবস্থাতেই হিস্টেরিয়া বা মেলানকোলিয়া বলা যায় না। বরং এই ধরনের অসুস্থতাকে ইংরেজিতে সম্ভবত ভার্টিগো (vertigo) বলা হয়। এটি সম্ভবত এক ধরনের মাথাব্যথা, যাতে মাথা ঘোরে এবং ঘাড় ও আশপাশের পেশীতে টান অনুভূত হয়। এ অবস্থায় রোগীর পক্ষে হাঁটা বা দাঁড়ানো কঠিন হয়ে যায়, কিন্তু চেতনা বা জ্ঞান–বুদ্ধির উপর এর কোনো প্রভাব পড়ে না।

এই কারণে এই অধম বহুবার হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)–কে এমন আক্রমণের সময় দেখেছেন, কিন্তু কখনো এমন কোনো অবস্থা দেখেননি যেখানে তাঁর জ্ঞান বা অনুভূতিতে কোনো প্রভাব পড়েছে। তদুপরি, হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)–এর এই অসুস্থতাও প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা.)–এর একটি ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে প্রতিশ্রুত মসীহ দুইটি হলুদ চাদরে (অর্থাৎ দুইটি রোগে) আচ্ছাদিত অবস্থায় অবতীর্ণ হবেন। দেখুন: মিশকাত, 'আশরাতুস্–সা'আহ' অধ্যায়, মুসলিম ইত্যাদির সূত্রে।

আর বর্ণনায় যে কথাটি এসেছে যে প্রথম আক্রমণের সময় তিনি আকাশের দিকে কোনো কালো বস্তু উঠতে দেখেছিলেন–এটিও মাথা ঘোরা রোগে একটি সাধারণ ঘটনা। মাথা ঘোরার কারণে আশপাশের বস্তুগুলো ঘুরতে ঘুরতে উপরের দিকে উঠছে বলে মনে হয়। আর এমন আক্রমণের সময় রোগীর সাধারণত চোখ বন্ধ করে রাখার প্রবণতা থাকে, ফলে সেই বস্তুগুলো প্রায়ই কালো রঙের বলে মনে হয়। তদুপরি বর্ণনায় যে আক্রমণের সময় সংজ্ঞাহীনতার মতো একটি অবস্থার উল্লেখ রয়েছে–যেমন শব্দগুলো থেকেও বোঝা যায়–তা প্রকৃত সংজ্ঞাহীনতা বোঝায় না। বরং অতিরিক্ত দুর্বলতার কারণে চোখ খুলতে না পারা বা কথা বলতে না পারাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক ভালো জানেন।)

এই বিষয়ে আরও গভীর ধারণার জন্য ৮১, ২৯৩ ও ৪৫৯ নম্বর বর্ণনাও দেখা উচিত, যেগুলো এ প্রশ্নে আরও আলোকপাত করে।

{২০} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হযরত ওয়ালিদা সাহেবা আমাকে বর্ণনা করে বলেছেন যে হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) প্রথম বায়আত গ্রহণ করেছিলেন লুধিয়ানায়। প্রথম দিন চল্লিশজন ব্যক্তি বায়আত করেছিলেন। পরে যখন তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন, তখন কিছু নারীও বায়আত করেন। সর্বপ্রথম বায়আত করেছিলেন মাওলভী সাহেব (অর্থাৎ হযরত মাওলভী নূরুদ্দীন সাহেব)।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনি কখন বায়আত করেছিলেন?

ওয়ালিদা সাহেবা বললেন: "আমার সম্পর্কে প্রচলিত আছে যে আমি বায়আত গ্রহণে বিলম্ব করেছিলাম এবং কয়েক বছর পরে বায়আত করেছিলাম। এটি ভুল। আমি কখনোই তাঁর থেকে আলাদা ছিলাম না; সবসময় তাঁর সঙ্গেই ছিলাম এবং শুরু থেকেই নিজেকে বায়আতের অন্তর্ভুক্ত মনে করতাম। তাই আমার জন্য আলাদা করে আনুষ্ঠানিকভাবে বায়আত নেওয়া প্রয়োজন মনে করিনি।"

এই বিনীত ব্যক্তি উল্লেখ করছে যে প্রাথমিক বায়আতের সময় হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) এখনো মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবি করেননি; বরং একজন মুজাদ্দিদের সাধারণ পদ্ধতিতেই তিনি বায়আত গ্রহণ করছিলেন।

আমি তখন ওয়ালিদা সাহেবাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে মাওলভী সাহেব ছাড়া প্রথম দিনে আর কারা বায়আত করেছিলেন। তিনি মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব সনৌরী এবং শেখ হামিদ আলী সাহেবের নাম উল্লেখ করেন।

{২১} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হযরত ওয়ালিদা সাহেবা আমাকে বর্ণনা করে বলেছেন যে যখন হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) তাঁর মসীহ হওয়ার দাবিটি প্রকাশ করতে শুরু করেন, তখন তিনি কাদিয়ানে ছিলেন। এ বিষয়ে প্রাথমিক পুস্তিকাগুলো তিনি সেখানেই লিখেছিলেন। পরে তিনি লুধিয়ানায় গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর দাবি প্রকাশ করেছিলেন।

ওয়ালিদা সাহেবা বলেন, দাবি প্রকাশ করার আগে তিনি তাকে বলেছিলেন:

"আমি এমন একটি বিষয় ঘোষণা করতে যাচ্ছি, যার ফলে দেশে প্রবল বিরোধিতার ঝড় উঠবে।"

তিনি আরও বলেন যে এই ঘোষণা করার পরে প্রাথমিকভাবে যারা বায়আত করেছিলেন তাদের মধ্যেও কেউ কেউ বিচ্যুত হয়ে যায়।

{২২}বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হযরত ওয়ালিদা সাহেবা আমাকে বর্ণনা করে বলেছেন যে একবার হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) সিয়ালকোটে মীর হামিদ শাহ সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন এবং ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন তিনি তাঁর জিহ্বা থেকে একটি বাক্য উচ্চারিত হতে শুনলেন। তিনি মনে করলেন এটি একটি ইলহাম।

পরে তিনি জেগে উঠলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি কি এইমাত্র কোনো ইলহাম পেয়েছেন? তিনি বললেন: "হ্যাঁ। তুমি কীভাবে জানলে? তিনি বললেন: "আমি শব্দ শুনেছি।"

এই বিনীত ব্যক্তি তখন জিজ্ঞাসা করল, ইলহামের সময় তাঁর কী অবস্থা হতো। ওয়ালিদা সাহেবা বললেন: "তাঁর মুখ লাল হয়ে যেত এবং কপালে ঘাম এসে যেত।"

এই বিনীত বর্ণনাকারী আরও উল্লেখ করে যে একবার হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) তাঁর বাড়ির ছোট আঙিনায় একটি কাঠের তক্তপোশে বসে ছিলেন (অর্থাৎ যে আঙিনাটি এখন ওয়ালিদা সাহেবার আঙিনা)। সম্ভবত সকাল বা সন্ধ্যার সময় ছিল। তিনি কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে পড়লেন। তখন তাঁর ঠোঁট থেকে কিছু শব্দ শোনা গেল, কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারিনি। পরে তিনি জেগে উঠে বললেন: "এইমাত্র আমি একটি ইলহাম পেয়েছি।" কিন্তু সেই ইলহামের শব্দগুলো এই বিনীত ব্যক্তির মনে নেই।

ওয়ালিদা সাহেবা আরও বলেন যে যখনই তিনি ইলহাম পেতেন, তখনই তন্দ্রার অবস্থা থেকে জেগে উঠে তা লিখে ফেলতেন। প্রথমদিকে তিনি সাধারণ কোনো বইয়ে তা নোট করে রাখতেন। পরে তিনি বড় আকারের একটি খাতা তৈরি করিয়েছিলেন। এরপর একটি ছোট কিন্তু মোটা নোটবুকও বানিয়েছিলেন।

এই বিনীত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল: "এখন সেই নোটবুক কোথায়?চ

ওয়ালিদা সাহেবা বললেন: "এটি তোমার ভাইয়ের কাছে আছে।" (ভাই বলতে তিনি হযরত মির্জা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব, খলিফাতুল মসীহ সানি (রা.)–কে বোঝাচ্ছিলেন।)

আমার মামা ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেবও বলতেন যে তিনি একবার স্বচক্ষে হযরত সাহেবকে ইলহাম প্রাপ্ত হতে দেখেছিলেন।(চলবে)

(সীরাতুল মাহদী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫–১৮, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

(খুতবার শেষাংশ...)

কবরের চেয়েও সংকীর্ণ ছিল, সেখানে গিয়ে ইবাদত করতেন। আর তাঁর মোটেও এ সংকল্প ছিল না যে, সেখান থেকে বাইরে আসবেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রজ্ঞার অধীনে তাঁকে বাইরে নিয়ে আসেন এবং তাঁর মাধ্যমে জগতের সামনে নিজের নূর প্রকাশ করে দেন।" (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১২৫–১২৬)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই নূর থেকে কল্যাণ লাভের তৌফিক দান করুন; আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের হক আদায় করার তৌফিক যেন আমরা লাভ করি এবং তাঁর (সা.) উত্তম আদর্শ অবলম্বনের সামর্থ্য লাভ করি; আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর (সা.) উত্তম আদর্শ অনুযায়ী চলার এবং প্রকৃত অর্থেই তা আত্মস্থ করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir